দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ৩ নভেম্বর, ২০২৫।। ১৬ কার্তিক, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

পঞ্চ পরিবর্তন

সঙ্ঘ শতবর্ষ

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ১৬ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৩ নভেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

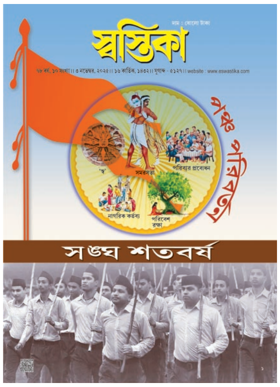

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

শুভেন্দুবাবুকে ধরতে তৎপর কেন মুখ্যমন্ত্রী? নেই তাই খাচ্ছ... ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

প্রচুর মামলায় ফতুর ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

সময়ের সঙ্গে সঙ্ঘের প্রচার-প্রসার কাজের অগ্রগতি
◻ ড. আর. বালাশঙ্কর ◻ ৮

সাচার কমিটির রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষার দায় কার? শুধু বাঙ্গালি হিন্দুর, নাকি ভারত সরকারেরও? ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

জাতির স্বাভিমানের প্রতীক ব্যক্তিজীবনে 'স্ব'-এর অভিব্যক্তি
◻ রাজদীপ মিশ্র ◻ ১৩

উন্নত দেশের আবশ্যিক শর্ত নাগরিক শিষ্টাচার পালন
◻ রামদত্ত চক্রধর ◻ ১৫

সঙ্ঘ শতবর্ষে পঞ্চপরিবর্তনের একটি—পরিবার প্রবোধন
◻ সারদা প্রসাদ পাল ◻ ১৭

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষের যাত্রায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিন
◻ প্রবীর কুমার মিত্র ◻ ১৯

ডাকাত কালী এবং মা সারদা ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

ত্রিপুরার মাতাবাড়ির দীপাবলী উৎসব ◻ অপু সাহা ◻ ৩৪

বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘের প্রচারক পরম্পরা
◻ অদ্বৈতচরণ দত্ত ◻ ৩৫

পঞ্চপরিবর্তন---পরিবেশ সংরক্ষণ ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ◻ যোগিনী বাপট ◻ ৩৮

জাতীয় পুনর্জাগরণে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন ও অভিযান
◻ সত্যনারায়ণ মজুমদার ◻ ৪৩

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻

প্রকাশিত হবে
১০ নভেম্বর
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১০ নভেম্বর
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ

স্বাধীনতা আন্দোলনের অমোঘমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' এবছরই দেড়শো বছরে পদার্পণ করছে। রাষ্ট্রবোধনের মন্ত্র হিসেবে বন্দেমাতরম্ জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। রাষ্ট্রবিরোধীদের চাপে পড়ে এই মন্ত্রের অঙ্গচ্ছেদনও করতে হয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পঞ্চ পরিবর্তন—এক যুগান্তকারী আহ্বান

বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক যুব সংগঠনের নাম যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাহা শুধু ভারতবাসী নহে, সমগ্র বিশ্ববাসীও অবগত রহিয়াছেন। নাগপুরের যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ কেশব বলিরাম হেগেওয়ার ভারতজননীর পুত্ররূপ সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের সংগঠন করিয়া দেশকে পরম বৈভবশালী করিবার লক্ষ্যে ১৯২৫ সালে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতেই নানা বিরোধিতা,অপপ্রচার,কুৎসার স্বীকার হইয়াও সমাজের সজ্জনশক্তির আশীর্বাদে এই বৎসরই বিজয়াদশমীতে তাহার যাত্রা শতবর্ষ পূর্ণ করিয়াছে। পরাধীনতার কালে রাষ্ট্রব্রতী এই সংগঠন যে বৈদেশিক শাসকের রোষানলে পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা ভারতবর্ষের উত্থান তো তাহাদের কাম্য নহে, চিরকালই তাহারা ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলিত ও পদদলিত রাখিতে চাহে। কিন্তু অস্বাভাবিক হইল স্বাধীন ভারতে শাসক কংগ্রেস দলও ইহার অপপ্রচার ও বিরোধিতা করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিয়া চলিয়াছে। মিথ্যা অভিযোগে তাহারা তিনবার এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সমাজের আশীর্বাদে সঙ্ঘ প্রতিবার সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে শুধু নহে, প্রতিবার আরও অধিক তেজোদ্দীপ্ত হইয়া পূর্ণোদ্যমে রাষ্ট্রসেবায় মনোনিবেশ করিয়াছে। বৈদেশিক মতাদর্শপুষ্ট কমিউনিস্টরাও বহুবার সঙ্ঘকে আঘাত করিয়াছে। বহু স্বয়ংসেবককে তাহারা হত্যা পর্যন্ত করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রসেবায় ব্রতী সঙ্ঘের অগ্রগতিকে তাহারা রুদ্ধ করিতে পারে নাই। বরং তাহারাই ভারতীয় জনমানস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চিরতরে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইতিহাস সাক্ষী, ভারতবর্ষে মাটিতে রাষ্ট্রবিরোধীরা চিরকাল নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং রাষ্ট্রব্রতীরা স্বমহিমায় আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। সঙ্ঘের শতবর্ষের পর্যালোচনায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই বিষয়ে প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখিত হইয়াছে যে রাষ্ট্রসেবায় ব্রতী সঙ্ঘ কীভাবে স্বমহিমায় তাহার শতবর্ষ পূর্ণ করিয়া অগ্রগতির পথে চলিয়াছে আর শুধুমাত্র রাষ্ট্র বিরোধিতাকে মূলমন্ত্র করিয়া কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া কীরূপে নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে। এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সমাজরূপী রাষ্ট্রদেবতার সেবা করিয়াই সঙ্ঘ অজেয় শক্তির অধিকারী হইয়াছে।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, সংগঠিত ও সংস্কারিত সমাজই জাতির মেরুদণ্ড। আত্মবলে বলীয়ান হইলে জাতি অমর হয়, অজেয় হয়। সেই জন্য সঙ্ঘ তাহার যাত্রাপথে শতবর্ষ পূর্ণ করিয়া সম্পূর্ণ সমাজের আত্মবল বৃদ্ধির নিমিত্ত পঞ্চ পরিবর্তনের আহ্বান জানাইয়াছে। সর্বপ্রথম ব্যক্তিজীবনে 'স্ব'-এর অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটাইবার কথা বলা হইয়াছে। কেননা জাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটিলেও ব্যক্তিজীবন তথা রাষ্ট্রজীবনে প্রশাসনিক স্তরে 'স্ব'-প্রকাশের কোনোরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহার পর ক্রমান্বয়ে পারিবারিক জীবনে মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, নাগরিক জীবনে কর্তব্যবোধ নির্মাণ, ভেদাভেদরহিত সমাজ রচনা এবং প্রকৃতিকে মাতৃজ্ঞান করিয়া পরিবেশ-বান্ধব জীবনযাপনের কথা বলা হইয়াছে। ইহার জন্য সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ দেশব্যাপী গৃহ সম্পর্ক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। স্বয়ংসেবকদের বিশ্বাস যে, তাহাদিগের আহ্বানে সমগ্র সমাজ ইহাতে শামিল হইবে। আনন্দের বিষয় যে, সমাজবিজ্ঞানীরা সঙ্ঘের এই প্রচেষ্টাকে যুগান্তকারী অভিযান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বের বহু রাজনেতা এই উদ্যোগের প্রশংসা করিয়াছেন। সমগ্র পৃথিবী আজ বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ, যুদ্ধ, মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবনমন ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত। ইহার সমাধানকল্পে তাহারা ভারতের মুখাপেক্ষী রহিয়াছে। সঙ্ঘ পঞ্চ পরিবর্তনের দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উদাহরণ সৃষ্টি করিতে চায়। সঙ্ঘ তাহার সংকল্প সফল করিবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, কেননা সঙ্ঘের সহিত সমগ্র সমাজ রহিয়াছে।

সুভাষিতম্

অপেক্ষন্তে ন চ স্নেহং ন পাত্র ন দশান্তরম্ ।
সদা লোকহিতে যুক্তা রত্নদীপা ইবোত্তমাঃ।।

লোকহিতে যুক্ত ব্যক্তিরা রত্নদীপের মতো বিনা তেল, পাত্র ও সলতে অর্থাৎ সমাদর, যোগ্যতা ও প্রতিদানের আশা না করে কাজ করে থাকেন।

শুভেন্দুবাবুকে ধরতে তৎপর কেন মুখ্যমন্ত্রী?

নেই তাই খাচ্ছ...

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিলক্ষণ জানেন শুভেন্দু অধিকারীকে জেল বা পুলিশ গারদের বাইরে রাখা তাঁর প্রশাসনের জন্য কতটা মারাত্মক। সিপিএম কখনো বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে জেল বা পুলিশ হেফাজতে রাখেনি। যুৎসই মামলাও দেয়নি। তারা তাঁর জঙ্গিপনাকে নাটক ভাবত। আইনি ব্যবস্থা নিত না। ফলে তিনি নেত্রী হননি। অত্যাচারী আর ক্ষমতালোভী হয়েও তাঁর প্রতি সিপিএমের ব্যবহার অভাবনীয়। সিপিএম চাইলে তাঁর সব আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে পারত। কিন্তু সিপিএম নয়, তাঁর আসল সমস্যা ছিল রাজ্য কংগ্রেস নেতারা।

তিনি এখন ঠিক উলটো করছেন। যে কোনো প্রকারে তিনি শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেপ্তার করতে চান। আগাছা তৃণমূল সমর্থক আর বুদ্ধিহীনরা দাবি করেন উভয়ের সম্পর্ক অম্লমধুর। বোকা আর বুদ্ধিহীন বামপন্থীরা বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে সেটিংতত্ত্ব নিয়ে অপপ্রচার করেন।

আদিতে কংগ্রেস, তারপর বিদেশি সিপিএম আর এখন তৃণমূল ক্লাবের বদান্যতায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। দাবি শুনলেই তা বোঝা যায়। সিপিএম শাসনের কাছে বিরোধী নেত্রী কোনোদিন আশঙ্কার কারণ ছিলেন না। কারণ সিপিএম বিশ্বাস করত না যে তিনি তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। শেষের বেলাতেও সিপিএমের এক মন্ত্রী একজন জাঁদরেল কংগ্রেস নেতাকে অঙ্ক কষে দিল্লিতে জানিয়েছিলেন, সিপিএম কেন ২০১১-র ভোট জিতবে। ফল উলটো হওয়ায় তিনি জানতে পারেন সিপিএমের জেলা কমিটিগুলিই রাজ্য নেতাদের বিভ্রান্ত করতে মিথ্যা জেতার রিপোর্ট পাঠাত। তখন সিপিএম সিপিএম-কে হারিয়েছিল। তৃণমূলের কোনো ভূমিকা ছিল না। আর ঠিক তাই শুভেন্দুবাবুকে যে কোনো প্রকারে আটক করতে চান বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুবাবু দাবি করেছিলেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির ভিতর থেকে খবর পান। আদালত চাইলে তিনি এটাও জানাতে পারেন তৃণমূলের জাতীয় দলের তকমা বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী কতবার ফোনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের করা ২০টির মধ্যে ১৫টি মামলা খারিজ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রমাণ হয়েছে শুভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কতটা হিংসাশ্রয়ী। বাকি ৫টি মামলায় বিশেষ তদন্ত কমিটি বা 'সিট' গঠন করে সিবিআই-কে রাখা হয়েছে। আদালত বুঝিয়েছে শুভেন্দুবাবুর ব্যাপারে কেন তৃণমূল পরিচালিত সরকারকে বিশ্বাস করা অনুচিত। কেন-বা শুভেন্দুবাবুকে অন্যরূপে রক্ষাকবচ দেওয়া প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, আদলত রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে শুভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে মুড়ি-মুড়কির মতো ফৌজদারি মিথ্যা মামলা করা অনুচিত। কিন্তু 'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনি।'

পরের মাস থেকে রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মাত্র ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ২০০২-এর তালিকার সঙ্গে সাযুজ্য পাওয়া গিয়েছে। গত তেরো বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে ভোটার বৃদ্ধির হার অভূতপূর্বভাবে আনুমানিক ১৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে কিছু সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে। ২০০২ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৮.০২ কোটি আর ভোটার ৪.৫৮ কোটি। ২০২৪ পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল ১০.৩২ কোটি আর ভোটার ৭.৫৮ কোটি। শুভেন্দুবাবু যেমন মুখ্যমন্ত্রীর ভবানীপুর কেন্দ্রকে পাখির চোখ করে ২০২৬-এর ভোটে এগোচ্ছেন, তেমনই নন্দীগ্রামকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগোচ্ছে তৃণমূল।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রামে ছাউনি ফেলেছেন। আর তাই ২০২৬-এর ভোটের লড়াইয়ের কেন্দ্র ভবানীপুর বনাম নন্দীগ্রাম। ভবানীপুরে জিততে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু হিংসা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে সেটাই স্বাভাবিক। সিপিএম বিরোধী নেত্রীকে কোনোদিন আটক করেনি। এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শুভেন্দুবাবুকে সেটাই করতে চান। তবে তাতে লাভ শুভেন্দুবাবুর। একসময় রাজ্য-রাজনীতির পিছনের সারিতে দাঁড়ানো মুখ এখনকার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুবাবুর অনুপাতে পিছনের সারিতেই রয়েছেন। নন্দীগ্রামে তাঁকে হারিয়েছিলেন শুভেন্দুবাবু। এখন সেই ঘা দগদগে হয়ে উঠেছে। ২০২৬-এর লড়াইয়ে তাই শুভেন্দুবাবুকে যে কোনোভাবে আটক আর হেনস্থা করে ভবানীপুর আর নন্দীগ্রাম একসঙ্গে জিততে চান মুখ্যমন্ত্রী। মনে রাখা প্রয়োজন, ২০০৬ সালে সিঙ্গুর আন্দোলনে বেআইনিভাবে জাতীয় সড়ক আটকে রাখা বিরোধী নেত্রী আটক হলে তিনি কোনোদিন মুখ্যমন্ত্রী হতেন না। সিপিএম প্রতিহিংসার রাজনীতি করেনি তাই তিনি বায়বীয় হননি। শুভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে সেই প্রতিহিংসার রাজনীতির উত্থান ঘটিয়ে তিনি কি রেহাই পাবেন?

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

প্রচুর মামলায় ফতুর

আদালত কন্যাযু দিদি,

'আদালত ও একটি মেয়ে' নামে একটা নাটক ছিল। অনেককাল আগের কথা। যতদূর মনে পড়ছে এই নামে একটা সিনেমাও হয়েছিল। তবে তার সঙ্গে আপনার তুলনা করতে চাই না। আদালতের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা শুধুই হেরে যাওয়ার। কত মামলায় যে হেরেছেন দিদি, তা গুণে শেষ করতে পারব না। তবে আমি জানি, আপনি আসলে হারেননি। জিতেছেন। কারণ আপনি জেতার জন্য মামলা করেননি কখনও। সব সময়ে সময় নষ্ট করার জন্য করেছেন। আপনি জানেন, কী করতেই হবে কিন্তু আপনি সব সময়ে চেষ্টা করে যান সেই কাজটার জন্য যতটা সম্ভব সময় কিনতে হবে। কিন্তু দিদি, আমাদের এই গরিব রাজ্যে মাত্র পাঁচ বছরে উকিলদের ফি বাবদ খরচ ৬৫.৪৭ কোটি টাকা কি ঠিক বলুন! সম্প্রতি রাজ্য সরকারের আইন দপ্তরের এই তথ্য সামনে এসেছে। খরচ তো হতেই পারে। সব রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকেও মামলা লড়ার জন্য খরচ করতে হয়। কিন্তু সেই সব মামলার বেশিটাই হয় মানুষের স্বার্থে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এই ৬৫ কোটি টাকার বেশিটাই খরচ হয়েছে দুর্নীতিবাজদের বাঁচাতে গিয়ে। সেই সঙ্গে আপনার একগুঁয়ে মনোভাবের জন্য। এটা কিন্তু মানতেই হবে দিদি।

২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪, এই পাঁচ অর্থবর্ষ মিলিয়ে ৬৫.৪৭ কোটি টাকা খরচ। অঙ্কটা ভাবুন। ৬৫.৪৭ কোটি টাকা। এই টাকায় রাজ্যে কতগুলো প্রাথমিক স্কুল তৈরি সম্ভব ছিল বলুন তো! তার বদলে স্কুলের জাল শিক্ষকদের বাঁচানোর মামলায় এত্ত টাকা খরচ হয়ে গেল।

আমি যখন তালিকাটা দেখেছি তখন সত্যি বলছি, আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এই রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। এই যে দুর্নীতি, যেখানে স্পষ্ট প্রমাণ টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে তৃণমূলের এক দল নেতা। আর সেই নেতাদের বাঁচাতে কোটি কোটি টাকা দিয়ে রাজ্য সরকার আদালতে মামলা লড়েছে। সত্যের জয় হওয়ায় রাজ্য হেরেছে। কিন্তু আমাদের করের টাকার এই ভাবে নয়-ছয় মেনে নেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের পড়ুয়ারা যোগ্য শিক্ষকদের কাছে পড়তে চায়। এটাই তো শুধু চাওয়া। সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার দিল্লির দামি দামি এবং দলেরই নেতা, সাংসদ উকিলদের পকেটে কোটি কোটি টাকা ঢুকিয়েছে। এও কি কম বড়ো দুর্নীতি!

এসব আমি কিন্তু বলছি না দিদি। বলছে, আপনার সমালোচকেরা। তাঁরা এটাও বলছে যে, দুর্নীতি হয়েছে বুঝেও নিয়োগ মামলা থেকে সরকারি কর্মচারীদের হকের দাবি ডিএ নিয়ে অযথা মামলা। কোটি কোটি টাকা খরচ। এসব যাঁরা বলছেন, তাঁরা তো দিদি আপনার মতলবটাই বুঝতে পারেননি। আপনি সময় কিনে কত যে রাজনৈতিক লাভ করেছেন

দিদি, গত কয়েক বছরে আপনি যা করেছেন তার জন্য বাঙ্গালিকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। আদালতে গিয়ে এত মজা দিয়েছেন যে সেটা নিয়ে একটা মজার ওয়েব সিরিজ হয়ে যেতে পারে।

সেই অঙ্কটা আর কজন বোঝে বলুন!

আদালত শুরুতেই বলে দিয়েছিল ওবিসি তালিকা ঠিক হয়নি, বলে দিয়েছিল প্রাথমিকের নিয়োগে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি। তবু আপনি গোঁ ধরে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন। মুখ পুড়েছে সব মামলায়। সেই সঙ্গে কোষাগার খালি হয়েছে। কিন্তু কেন! কোন অধিকারে রাজ্যের মানুষের করের টাকা নিয়ে এমন ছেলেখেলা! এসব প্রশ্ন কিন্তু মূর্খ বাঙ্গালিরা করছে দিদি।

আপনি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মামলা আর মামলা। আপনি কিন্তু রেকর্ড করেছেন দেশে। সেটা বিশ্ব রেকর্ডও হতে পারে! ভারত কেন বিশ্বের কোথাও এমনটা আছে যে কোনো বিরোধী দলকে মিটিং, মিছিল করতে হলে আদালতের অনুমতি নিতে হয়! পূজার অনুমতি পেতে মামলা, ধর্মীয় শোভাযাত্রা বার করতে মামলা করতে হয়! বিরোধী দলের রাজনীতিকদের কথায় কথায় মামলা দিয়ে দেওয়া হয়। মুড়ি-মুড়কির মতো মামলা। এই ছেলেখেলার মামলাগুলোয় কত খরচ হয়েছে বলুন তো! হোক দিদি হোক। তবে করে যান। রেকর্ড গড়ে যান।

ভোট পরবর্তী হিংসায় এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকার রাজ্যের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধেই মামলা লড়েছে। এই যে ৬৫ কোটি উকিলের ফি তাতে কিন্তু আরজি কর মামলায় খরচ ধরা নেই। কারণ, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের হিসাব এখনো পাওয়া যায়নি। আরজি কর মামলা শুরুই হয় ২০২৫ সালের আগস্টে। সেটি যোগ করলে খরচ আনুমানিক ৭৫ থেকে ১০০ কোটি টাকা হয়ে যেতে পারে। উপাচার্য নিয়োগ মামলায় তো আরও মজার ঘটনা। মামলা হয়েছে রাজ্যেরই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। ফলে দুই পক্ষের উকিলের টাকাই সরকারি কোষাগার থেকেই যাচ্ছে। এটাই নিয়ম।

দেখুন দিদি, গত কয়েক বছরে আপনি যা করেছেন তার জন্য বাঙ্গালিকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। আদালতে গিয়ে এত মজা দিয়েছেন যে সেটা নিয়ে একটা মজার ওয়েব সিরিজ হয়ে যেতে পারে। □

অতিথি কলম

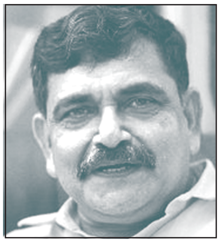

ড. আর. বালাশঙ্কর

সময়ের সঙ্গে সঙ্ঘের প্রচার-প্রসার কাজের অগ্রগতি

এটি সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়, যে সংগঠনটি তার আত্মপ্রকাশের পর থেকে বিগত এক শতাব্দী ধরে তার কার্যবিস্তার কালে ভারত জুড়ে তার অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা এই 'এক শতাব্দী সময়কাল'-এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ সময়ে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে সবরকম আত্মপ্রচার। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেড়ে ওঠার পর্যায়ে তারা নিজেদের কাজের প্রচার না করলেও আজ এই সংগঠনটি 'ন্যাশনাল ন্যারেটিভ' বা জাতীয় স্তরের বিমর্শের কেন্দ্রবিন্দুতে তাদের স্থান করে নিয়েছে।

সংগঠনটির নাম 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। ডাক্তারজী বলতেন যে, 'সঙ্ঘকাজ' এমন হবে যে, তা নিজেই কথা বলে উঠবে। সঙ্ঘ কখনও আত্মপ্রচার অভিমুখে ধাবিত হবে না। ১৯২৫ সালে বিজয়াদশমীর দিন প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ২৫ বছর ধরে সঙ্ঘের কোনো নিজস্ব প্রকাশনা বিভাগ ছিল না। সংগঠনটি ছিল শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রহীন ও আত্মপ্রচার-বিমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সঙ্ঘের প্রচারকরা এখনও সংযত এবং অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত।

সঙ্ঘকাজ শুরুর প্রথম দিকে মৌখিক প্রচারের ওপর নির্ভর করত সঙ্ঘ। বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে চলত প্রচারের কাজ। সংগঠনই মূলত রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রচারে সহায়ক ছিল। এই সময় সাংগঠনিক নেটওয়ার্কের দ্বারাই সম্পাদিত হয় সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার প্রচার-প্রসার। ভারতের বুকে রাষ্ট্রভক্তির আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল একটি সামাজিক- সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে ক্রমশ পরিচিতি লাভ করতে থাকে সঙ্ঘ। রাষ্ট্রীয় দর্শনের পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে দেশকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই সংকল্পবদ্ধ ছিল সঙ্ঘ। প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল এক পরম বৈভবশালী দেশ। পুনরায় সেই পরম বৈভবশালী রাষ্ট্রনির্মাণের স্বপ্ন ও কল্পনায় সমর্পিত হয় সঙ্ঘ। তার এই নিজস্ব পরিচিতিকে পাথেয় করে, রাষ্ট্রসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সংগঠন হিসেবে জাতীয় অঙ্গনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের কর্মসূচি, সাংগঠনিক নীতি ও পদ্ধতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। দেশভাগ পরবর্তী পর্যায়ে সংঘটিত হয় গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘের ওপর আরোপিত হয় নানা মিথ্যাচার। সঙ্ঘের চারিপাশে ছড়িয়ে পড়া এহেন মিথ্যাচার নিজস্ব আদর্শ ও অবস্থান স্পষ্ট করতে সঙ্ঘকে একপ্রকার বাধ্য করে। সংগঠন-সম্পর্কিত যাবতীয় ধোঁয়াশা কাটিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয় সঙ্ঘ।

'শাখা' নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্ঘের প্রভাব হলো সম্পর্ক দেশব্যাপী । এই কারণে জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর ফলে নিজস্ব প্রচার বিভাগ ও প্রকাশনা সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। বিশেষত এই পর্যায়ে ভারতের মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলি 'সঙ্ঘকাজ' তুলে ধরা বা সঙ্ঘের কার্যকলাপ প্রচারের বিষয়টি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলত। সঙ্ঘকাজের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়াই ছিল এই সংবাদমাধ্যমগুলির রীতি। কার্যবিস্তারের লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও রাজনীতি-সহ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসমাজ— দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল সঙ্ঘের সতর্ক দৃষ্টি। ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হতে থাকে সঙ্ঘ শাখা। প্রবাসী ভারতীয়রা হিন্দুত্বের প্রতি ব্যাপক ভাবে আকৃষ্ট হতে থাকেন। বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় 'হিন্দুত্ব' দর্শন। দীনদয়াল উপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবাণীর মতো বড়ো মাপের কার্যকর্তারা সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের দায়িত্ব নির্বাহ এবং সেখান থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়েই তাঁদের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী একাধারে ছিলেন একজন শক্তিশালী লেখক ও সুবক্তা। পি. পরমেশ্বরন, কে.আর. মালকানি, ভি.পি. ভাটিয়া, রঙ্গা হরি, এইচভি শেষাদ্রি, জয় দুবাশি, এস. গুরুমূর্তি, রাম মাধব, ভানুপ্রতাপ শুক্লা, দীননাথ মিশ্র, সুনীল আম্বেকর, জে. নন্দকুমারের মতো অসংখ্য শক্তিশালী সাংবাদিক ও সুলেখকদের জন্ম দিয়েছে সঙ্ঘ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থাগুলি হয়ে ওঠে স্বয়ংসেবকদের প্রতিভা বিকাশের কেন্দ্র।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ শ্রী জে. নন্দকুমার বর্তমানে 'প্রজ্ঞা প্রবাহ' নামক সংগঠনের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ১৫টি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, ৩৯টি জাগরণ পত্রিকা, চারটি দৈনিক পত্রিকা এবং ১৮টি প্রকাশনা সংস্থা পরিচালনা করছেন। তাঁরা 'জনম'-নামক একটি টেলিভিশন নিউজ বা সংবাদ চ্যানেলও পরিচালনা করে থাকেন। নন্দকুমারজী আরও বলেন যে, সমাজ রূপান্তরের লক্ষ্যে নিঃস্বার্থ সেবাকাজই হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ। নিঃস্বার্থভাবে সেবাকাজ পরিচালনায় গুরুত্বদানের কারণে প্রথম থেকেই প্রচারের অন্তরালে থেকে গিয়েছে সঙ্ঘ। কিন্তু সঙ্ঘের বিকৃত আখ্যান এবং সঙ্ঘের আদর্শ-সম্পর্কিত নেতিবাচক বিমর্শ প্রচারে সক্রিয় থাকে নানা স্বার্থান্বেষী মহল। প্রথাগতভাবে আত্মপ্রচার-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সংগঠনের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল এহেন উচ্চগ্রামে বাঁধা অপপ্রচারকে প্রতিহত করার জন্য প্রচার বিভাগের কাজ শুরু করে সঙ্ঘ। সঙ্ঘ বিষয়ক যাবতীয় বিভ্রান্তি কাটানো, সব অপপ্রচারের প্রত্যুত্তর দান এবং জাতীয় স্বার্থে সর্বাত্মকভাবে একটি ইতিবাচক ও রাষ্ট্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন তখন সঙ্ঘের কাছে 'অবশ্য কর্তব্য' হয়ে দাঁড়ায়। প্রচার বিভাগের কাজ শুরু করার অর্থ কিন্তু সঙ্ঘের 'আত্মপ্রচারবিরোধী' মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুতি কোনোভাবেই নয়।

গত কয়েক দশক ধরে ভারতীয় জনজীবনে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে সঙ্ঘ। এর পরিণামে ভারতীয় চিন্তাভাবনার পদ্ধতিতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। আজ ভারতের প্রকাশনা সংস্থা এবং পত্রপত্রিকার বৃহত্তম নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে অন্যতম হলো সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল। সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমগুলিতে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠনগুলি অনেক বেশি সক্রিয়।

দেশ-বিদেশের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের দৃষ্টির বাইরে। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় স্তরে প্রচার বিভাগের পূর্ণকালীন দায়িত্বে বর্তমানে রয়েছেন একজন বরিষ্ঠ প্রচারক। এই দায়িত্বটি সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহের দায়িত্বের সমতুল। সামাজিক মাধ্যমে সঙ্ঘের চিন্তাধারা প্রসারের কাজেও ব্যাপৃত প্রচার বিভাগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নিজস্ব প্রচার বিভাগ বাদে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এবং পত্রপত্রিকাগুলি কিন্তু সরাসরি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালিকানাধীন নয়। সংস্থাগুলি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত। এই কারণে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত প্রায়শই বলেন, 'সঙ্ঘ শুধু সংগঠন করবে , আর স্বয়ংসেবকরা প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করবে।'

আজ স্বয়ংসেবকরা ভারতের প্রায় সব ক'টি ভাষায় প্রকাশনা সংস্থা পরিচালনা করছেন। দেশজুড়ে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কম্বাইন্ড সার্কুলেশন বা মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। এই প্রকাশনা সংস্থাগুলির অধিকাংশই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাগুলি ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পত্রিকাগুলির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে বিতর্ক, গঠিত হয়েছে জনমত। গোহত্যা নিবারণ, গঙ্গাদূষণ রোধ, স্বদেশি অভিযান, শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলন, ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, নির্বাচনী সংস্কার, ওয়াকফ বোর্ডকে সামনে রেখে জেহাদি সন্ত্রাসের মতো বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে এই পত্রিকাগুলির পাতায়। এছাড়াও আলোচিত হয়েছে দেশের আরও নানা সমস্যা ও তার সমাধান। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা পরিচালনার কাজ শুরু করে। প্রথমে লক্ষ্ণৌ থেকে হিন্দিতে 'পাঞ্চজন্য' এবং দিল্লি থেকে ইংরেজি ভাষায় 'অর্গানাইজার' প্রকাশিত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে আরও অনেকগুলি আঞ্চলিক প্রকাশনা সংস্থার কাজ শুরু হয়। বর্তমানে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

বর্তমানে অনলাইন সংস্করণের যুগে মুদ্রিত হরফে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলি যখন অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন, তখনও স্বয়ংসেবকদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকাগুলি তাদের সার্কুলেশন বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। পত্রিকাগুলির গ্রাহক তথা পাঠক সংখ্যা কিন্তু কমেনি। মালয়ালম ভাষায় প্রকাশিত 'কেশরী'র মতো পত্রিকা বিজ্ঞাপন অপেক্ষা গ্রাহক মূল্য হতে সংগৃহীত আয়ের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল। বর্তমানে এই পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে এই পত্রিকাগুলির আকার-আকৃতি, প্রচ্ছদ, লেখালেখির মান ইত্যাদি আরও উন্নত হয়েছে। প্রতিটি পত্রিকারই অনলাইন সংস্করণ রয়েছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যা বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ব্যক্তি ও স্বয়ংসেবকদের কাছে পৌঁছে যায়।

সঙ্ঘ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা চালিত পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থাগুলিও তিনবার নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়। প্রতিবার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ার পর নিজস্ব পাঠক সংখ্যা পুনরুদ্ধারে পত্রিকাগুলি কোনোরকম সমস্যায় পড়েনি। স্বয়ংসেবকদের দ্বারা চালিত অধিকাংশ প্রকাশনা সংস্থা প্রাইভেট (বেসরকারি) বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধীকৃত। লাভজনক সংস্থা না হলেও প্রতিটি সংস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন ছাড়াও বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের থেকে এই পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন সংগৃহীত হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে মূলধারার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে বহিষ্কৃত ও নির্বাসিত ছিলেন রাষ্ট্রবাদী সাংবাদিকরা। সাংবাদিকতার পেশায় যুক্ত স্বয়ংসেবকদের কার্যত একঘরে করে রাখা হয়। 'স্বয়ংসেবক' পরিচয়ে পরিচিত কোনো ব্যক্তির পক্ষে সংবাদমাধ্যমে চাকরি পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। দেশজুড়ে জাতীয়তাবোধের জাগরণ সত্ত্বেও এহেন বৈষম্য আজও বিদ্যমান।

জাতীয় স্তরে বাম ও কংগ্রেসপন্থী পত্রিকাগুলির প্রাধান্যের সঙ্গে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকাগুলির প্রভাবের তুলনামূলক বিশ্লেষণও আজ খুবই প্রাসঙ্গিক। বাম ও কংগ্রেসি পত্রিকাগুলি একদা ভারত সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অর্থসাহায্যে পুষ্ট হলেও স্বয়ংসেবকদের দ্বারা চালিত প্রকাশনা সংস্থাগুলি ছিল স্বনির্ভর। সরকারি সাহায্য বা রাজনৈতিক আনুকূল্যের ওপর তারা কোনোদিনই নির্ভরশীল ছিল না। ফলে কালের নিয়মে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসি পত্রিকাগুলি হারিয়ে যেতে থাকলেও রাষ্ট্রবাদী দর্শনের প্রচার মাধ্যমগুলি এখনও ভালোভাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারির আগে 'অর্গানাইজার' ও 'পাঞ্চজন্য' প্রকাশনা সংস্থা 'ভারত প্রকাশন'--- 'মাদারল্যান্ড'-নামক একটি অসাধারণ পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে। দিল্লি থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এই দৈনিক পত্রিকাটির গর্জনে ভীত, শঙ্কিত হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন। মাদারল্যান্ডের কার্যালয়ে পুলিশি অভিযান ও তল্লাশি চলে। পত্রিকাটির প্রেস (ছাপাখানা) ও বিভিন্ন মুদ্রণযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। মিসা আইনে গ্রেপ্তার হন পত্রিকার সম্পাদক কে.আর.মালকানি। পরবর্তীকালে 'মাদারল্যান্ড' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ সম্ভবপর না হলেও জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে অনবরত গর্জে ওঠে পাঞ্চজন্য ও অর্গানাইজারের প্রতিবাদী কলম। সাম্প্রতিক অতীতে, শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলনের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। অসংখ্য লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক ও সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় কর্মীর জন্ম দেয় এই আন্দোলন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই রাষ্ট্রবাদী সংবাদমাধ্যমগুলির 'এডিটোরিয়াল পলিসি' বা সম্পাদকীয় নীতিকে কিন্তু কখনোই প্রভাবিত করে না রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সংস্থাগুলিতে সঙ্ঘের কোনো সরাসরি হস্তক্ষেপও নেই। স্বয়ংসেবকদের চিন্তাধারা অনুযায়ী, স্বাধীন, স্বকীয়ভাবে পরিচালিত হয়ে চলেছে এতগুলি পত্র-পত্রিকা। প্রযুক্তির অস্বাভাবিক উন্নতির কারণে দেশজুড়ে যখন 'প্রিন্ট মিডিয়া' বা মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই লড়ছে, তখন রাষ্ট্রসেবায় নিবেদিতপ্রাণ স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগ, উদ্যম এবং সঙ্ঘের ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্কের দরুন রাষ্ট্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে যেন সঞ্চারিত হয়েছে নতুন প্রাণ।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

সাচার কমিটির রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং মূলধারার সংবাদমাধ্যমে একটা কথা বার বার বলা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের নাকি কোনো উন্নতি হয়নি গত আট দশকে। ফলে এই তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নাকি পিছিয়ে পড়া, 'অনগ্রসর' শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়টির সমর্থনে তুলে ধরা হয় 'সাচার কমিটি'র তৈরি একটি মিথ্যা রিপোর্ট। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ২০০৪ থেকে বামপন্থী সাংসদরা ইউপিএ-১ সরকারকে ইস্যুভিত্তিক সমর্থন দান করে। সরকারের বাইরে থেকে তাদের দেওয়া সমর্থনের জোরে কেন্দ্রে টিকে থাকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-১ সরকার। এই বামপন্থীরা কথায় কথায় সমর্থন তুলে নিয়ে সরকার ফেলে দেওয়ার হুমকি দিত। বাম দলগুলি 'ইউপিএ-১ সরকারের অন্তরাত্মা' সোনিয়া গান্ধীকে যখন ব্ল্যাকমেল করা শুরু করে, তখন তিনি তিনটি অস্ত্র দিয়ে তার মোকাবিলা করেন এবং শেষমেশ ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ফেলার পিছনে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর তিনটি অস্ত্রের একটি হলো এই সাচার কমিটির রিপোর্ট। বাকি দু'টি অস্ত্র হলো পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল এম.কে. নারায়ণন এবং মাওবাদী নেতা কিষেণজী।

কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমানদের অবস্থা ছিল কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করতে হলে প্রয়োজন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।

ভূমি সংস্কারের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জমির মালিকানা হিন্দুদের হাতে থেকে গেলেও, জমির অধিকার চলে যায় সিপিএম নেতা এবং মুসলমান কৃষকদের হাতে। জমি থেকে পুরো আয় তাদের হলেও, যেহেতু কৃষিকাজ থেকে আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর দিতে হয় না, তাই তাদের আয়ের অঙ্কও বোঝা যায় না। এদের অনেকেই ব্যাংকে টাকা রাখতো না। ফলে রাজেন সাচার সেই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করে তাদের আয় প্রায় শূন্য ধরেন।

হিমঘর একসময় হিন্দুদের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। কিন্তু রাজ্যে ভূমি সংস্কারের পর এবং জওহরলাল নেহরু প্রণীত 'অত্যাবশকীয় পণ্য আইন'-এর ফলে এই ব্যবসায়িক ক্ষেত্রটিতে ধীরে ধীরে বাঙ্গালি হিন্দুদের জায়গা নিতে থাকে মুসলমানরা। সময়ের সঙ্গে মুসলমানদের কবজা দৃঢ় হতে থাকায় পুরো সাপ্লাই চেন বা কৃষিপণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে হিন্দুরা সরে যেতে বাধ্য হয়। এইসব আইন-কানুনকে শিখণ্ডী বানিয়ে কত লোক যে কোটিপতি হয়েছে এবং কত হিমঘর মালিক ভিখারি হয়েছে, সেই হিসেব কারও কাছেই নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরো কৃষি সাপ্লাই চেন তথা হিমঘর, ফ্রিজ, গাড়ি, খুচরো ব্যবসা পুরোটা থেকেই বেরিয়ে যায় হিন্দু বাঙ্গালিরা। এই ব্যবসায়িক ক্ষেত্রটির দখল নেওয়ার পর রাস্তা দখল করে বাজার বসিয়ে 'কৃষিপণ্যের সংগঠিত বাজার'কে ধ্বংস করতে থাকে এরা। এই সংগঠিত বাজারগুলি ছিল হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে।

একই অবস্থা দেখা যায় মৎস্যচাষ, পোল্ট্রি, পশুপালন, গোপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও। যার মেডিসিন (ওষুধপত্র), হরমোন বা মাছের খাবার ও পশুখাদ্যের ব্যবসা করতেন, তাদেরও পাওনা দিনের পর দিন আটকে রেখে বা না দিয়ে রাস্তায় বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা থাকায় তারা কিন্তু 'ফেলিওর অফ কন্ট্র্যাক্ট'-এর মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি।

বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন দল এবং রাজ্য সরকারের দৌলতে বন্দরগুলিতে তাদের প্রভাব থাকায়, বিদেশ থেকে আসা নানা পণ্যসামগ্রী, অর্থাৎ ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী থেকে শুরু করে যাবতীয় আসবাবপত্র এবং ইন্টিরিয়র সামগ্রী ব্যবসা আজ মুসলমানদের হাতে। একসময় বন্দরে কংগ্রেস নেতা রাম পেয়ারী রাম বাম নেতা কলিমুদ্দিন শামসকে পর্যন্ত হারায়, যা আজ ভাবাই যায় না।

রাজ্যের প্রধান সড়কগুলি-সহ বিভিন্ন রাস্তার পাশেপ ঝুপড়িতে বসা খাবারের দোকান, ধাবা ইত্যাদির দখল আজ মুসলমানদের। কিন্তু অসংগঠিত ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হওয়ার কারণে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ— কোনোরকম করদানের বাধ্যবাধকতা তাদের নেই। সব ব্যবসাগুলি ক্যাশ বা নগদে চলে।

এক শ্রেণীর মুসলমান ব্যাংক প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত হলেও এদের আরেকটি শ্রেণী বেশ চতুর এবং তারা ব্যাংক ঋণ ঠিকভাবে পরিশোধ করে থাকে। সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বন্ধনের দরুন তাজের কেউ আর্থিকভাবে দুর্বল হলে অন্যান্যরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঙ্গালি হিন্দুদের মধ্যে বামপন্থার প্রভাব অতিরিক্ত হওয়ায় তারা চিটফান্ডের বেআইনি ব্যবসা এবং ব্যাংক প্রতারণায় যুক্ত হয়ে পড়ে নিজেদের ক্রেডিট রেটিং খারাপ করে। এই প্রক্রিয়ায় নিজের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করেছে বহু বাঙ্গালি যুবক।

আইএএস-আইপিএস পরীক্ষায় বহু বছর ধরে বাঙ্গালি ছেলেমেয়েরা সুযোগ না পাওয়ায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি নিয়ন্ত্রণেও আজকাল বাঙ্গালিরা পিছিয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালিরা ব্যাকফুটে। রাজ্য সরকারের ঠিকাদারিতে ঢুকছে বিহারী ও মুসলমান ঠিকাদাররা।

আল আমিন মিশন বছরের পর বছর ধরে মুসলমান ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এবং ছেলেমেয়েগুলিও যথেষ্ট পরিশ্রম করে, যে উদ্যোগ হিন্দু সংগঠন বা সনাতনী সংস্থা, মঠ-মন্দিরগুলির পক্ষ থেকে দেখা যায় না। এছাড়াও বিভিন্ন মুসলমান সংগঠন বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে 'হালাল সার্টিফিকেট' চালু করার ফলে মুসলমানরা বহু পণ্য অমুসলমানদের থেকে নেয় না। এখানে মুসলমানদের ব্যবসা ও আয় বাড়ে এবং হিন্দুরা কাজ ও ব্যবসা— দুই-ই হারায়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো, অধিকাংশ আয়ের ক্ষেত্রে কোনো কর দিতে হতো না ২০১৬ সালের আগে পর্যন্ত। ব্যাংকে রাখা হতো না টাকা। নোটবাতিল এবং জিএসটি প্রণয়নের পর দেশের একটা বড়ো অংশ বাধ্য হচ্ছে নিজস্ব আয়ের হিসাবত্র দাখিল করচে। ২০০৬ সালে রাজিন্দর সাচার কমিটি এদের আয়কে শূন্য ধরে নেয়।

বাঙ্গালি মুসলমানদের পূর্বপুরুষ যেহেতু হিন্দুসমাজের কায়স্থ, বৈশ্য ও তিলিদের একাংশ ছিল, তাই তারা কৃষি ও ব্যবসা বোঝে। এরা একটা ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করে। তারা কিন্তু অন্যান্যদের কাছে কোনো সহায়তা বা সমবেদনা আশা করে না। কিন্তু সেকুলার শক্তিগুলির নিশ্চিন্ত ভোটব্যাংক হওয়ার কারণে আমাদের দেশের তথাকথিত হিন্দু নেতারা এদের সবরকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এরা পরিশ্রম করে ব্যবসা করে উপার্জন করে। কিন্তু সুযোগ পেলে ছাড়বে কেন? তাই যখন কংগ্রেসের তৈরি সাচার কমিটির রিপোর্টের টোপটি গিলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ৯৯ শতাংশ মুসলমানকে ওবিসি কোটা দেন, তখন মুসলমানরা তা স্বাগত জানাবে না কেন?

পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষার দায় কার? শুধু বাঙ্গালি হিন্দুর, নাকি ভারত সরকারেরও?

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের গল্পটি নিশ্চয় সকলের মনে আছে? হস্তিনাপুরের রাজসভায় দুর্যোধনের অঙ্গুলিহেলনে দুঃশাসন সেদিন পঞ্চপাণ্ডব জায়া দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছিল, তাঁর সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল। সে সময় পাঞ্চালীর অমিত বিক্রম পঞ্চস্বামী কী করছিলেন? রাজসভায় উপস্থিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আমৃত্যু প্রতিজ্ঞা রক্ষায় স্থিতপ্রজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, বীরশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য প্রভৃতি বয়োজ্যষ্ঠদের ভূমিকা সেদিন কী ছিল? কৌরব পরিবারে দাসীপুত্র বিদুর আর কর্তৃত্বহীন মধ্যমপাণ্ডব ভীম ছাড়া কেউ এর তীব্র প্রতিবাদ করেননি। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সেদিন অদৃশ্য থেকে বস্ত্র না জোগালে দ্রৌপদীর নারীত্ব, সম্ভ্রম সবই ভূলুণ্ঠিত হয়ে যেত কুরু রাজসভায়।

আজ পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা প্রবাহ কি মহাভারতের সেই ঘটনাকে পুনঃস্মরণ করিয়ে দিচ্ছে না? বিগত প্রায় দেড় দশক ধরে এই রাজ্যের এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী- দুর্যোধনের অঙ্গুলিহেলনে দুধেলগাই-সম দুঃশাসনের দল নিত্যপ্রতিদিন যেভাবে বঙ্গজননীর বস্ত্রহরণ করে চলেছে তা কি কেউ চাক্ষুষ করছে না? সেদিন যেমনভাবে ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন নিশ্চুপ, ভীষ্ম-দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য সকলে বসে বসে অসহায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখছিলেন, কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি, দুর্যোধনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেননি, ঠিক তেমনিভাবে আজ বঙ্গজননীর সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে তাঁরা আজ সকলে নিশ্চুপ।

ক্যানিং, কালিয়াচক, নৈহাটি, চাঁচোল, ধুলাগড়, বাদুড়িয়া, আসানসোল, তেলনিপাড়া, মোমিনপুর, বেলডাঙ্গা, ইকবালপুর, শ্যামপুর, সামশেরগঞ্জ, মহেশতলা, গারুলিয়া, সন্দেশখালি— কত কত কত, আরও কত— হিন্দু নিগ্রহের এই তালিকা শেষ হওয়ার নয়। সব জায়গাতে একই প্যাটার্ন— অত্যাচারিত হিন্দু, আর অত্যাচারী সেই দুধেল গাই সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রীর লোকেরা। এ বছর থেকে আবার এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে। দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে লাগানো হয়েছে আজানের সময়সূচি। ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা— এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় প্রিন্ট করে প্যান্ডেলে ঝুলিয়ে বলা হয়েছে এ সময়গুলিতে দুর্গা প্যান্ডেলে চণ্ডীপাঠ, মন্ত্র, ঘণ্টা, ঢাকের বাদ্যি এগুলি বাজানো যাবে না। একেবারে বাংলাদেশের কপি পেস্ট। দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর বাঁচা যেন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ২০২১-এর নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় বেছে বেছে হিন্দু গ্রামগুলি হয়েছিল আক্রমণের শিকার। কত হিন্দুর ঘর পুড়েছিল, কত মা-বোন ধর্ষিতা হয়েছিল। ১৪৯ জন বিজেপি কর্মীর প্রাণ চলে গিয়েছিল তার হিসেব হয়তো পুলিশের খাতায় ঠিকঠাক লেখা হয়ে ওঠেনি, কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালি সে ঘটনা আজও ভুলতে পারেনি। সামনেই ২০২৬। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার একটি বিধানসভা ভোট। এই নির্বাচন বাঙ্গালির কাছে সৌভাগ্য পরিবর্তনের ভোর আনবে, নাকি বাঙ্গালি হিন্দুর জীবনে আরও একটি বিভীষিকাময় রাত এনে দেবে, সেটা সময়ই বলবে। তবে ভোরের আলো ফোটার আগে পুব আকাশের রং যেমন বলে দেয় দিন কেমন যাবে, সে রকম নির্বাচনের সাত আট মাস আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের পুব আকাশে নিকষ কালো মেঘের ঘনঘটা। ক'দিন আগেই উত্তরবঙ্গের দুই বিজেপি নেতা, সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর জেহাদিরা আক্রমণ চালিয়েছে। পাথর ছুঁড়ে, জুতো মেরে সেই অন্ধকার রাতের সংকেতই তারা দিয়ে রেখেছে। এখানেও আক্রমণকারীরা সেই জেহাদি দুধেল গাই সম্প্রদায়ভুক্ত।

> **২০১৯ থেকে বাঙ্গালি হিন্দু তারা প্রতিটি নির্বাচনে বারে বারে কেন্দ্র সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন জুগিয়েছে, মুখ চেয়ে বসে আছে এই ভেবে কেন্দ্র তাদের রক্ষা করবে। এখন কেন্দ্র সরকারেরই প্রমাণ করতে হবে যে তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখা উপযুক্ত কিনা।**

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দিনে রাজ্যবাসীর পাশে থাকার কথা যার, দেশের সেই সর্বময়কর্তা এখনও দিদি-ভাইয়ের মধুর সম্পর্ক রক্ষায় ব্যস্ত। এতে নাকি দেশের গণতন্ত্রের ভিত শক্ত হয়, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধুর সম্পর্ক পাকাপোক্ত থাকে। তাই তিনি বঙ্গজননীর আর্তনাদ না শোনার প্রতিজ্ঞায় অটল। এদিকে দিদির চেলা চামুণ্ডারা যে তার সন্তান-সম বাঙ্গালি

ফঃ ২

হিন্দুকে মেরে নির্বংশ করে দিচ্ছে সেদিন তাঁর হুঁশ নেই। রাজধর্ম কাকে বলে? হতভাগ্য বাঙ্গালিকে তবে কে বাঁচাবে? আমাদের আর এক নেতা, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি তুড়ি মেরে অশান্ত কাশ্মীরকে নিমেষে ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন তো অন্যদিকে এক নিমেষে মাওবাদীদের পলকে পৌঁছে দিতে পারেন যমের দক্ষিণ দুয়ারে, সেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী— কী কারণে জানি তিনিও আজ নিশ্চুপ, দ্রোণাচার্যের মতো। তাঁর তূণের সমস্ত তিরই বুঝি পশ্চিমবঙ্গের এই মহিলা দুর্যোধনের কাছে এসে থেমে গেছে। আর দেশ জুড়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সদা তৎপর বলে দাবি করা, 'সত্যমেব জয়তে'র বাণীধারী ভারতীয় সংবিধান অথবা 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' মন্ত্রের বার্তাবাহক সুপ্রিম কোর্ট, তাদের অন্তত আজ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য যে, তাঁরাও আজ না দেখার ভান করছেন। তাই আজ এই বিধর্মীর কাছে বঙ্গজননীর সতীত্ব রক্ষার আর বুঝি কোনো পথ নাই।

অনেক বছর থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জেহাদি মুসলমান, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা মুসলমান। যারা প্রকাশ্যে শাসকদলের সৈনিক রূপে কাজ করছে। বিরোধী নেতাদের প্রাণে মারার এই প্রয়াস কি কেবলমাত্র খগেন মুর্মুদের চ্যালেঞ্জ করা, নাকি তার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককেও চ্যালেঞ্জ জানানো? কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রাপ্ত এমএলএ, এমপিদের মেরে তারা তো দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। বলেছে, 'দেখো তুমি আমাদের কিছু করতে পারবে না। তোমার পোষা সিআইএসএফ-এর প্যারা মিলিটারি জওয়ানরা, যাদের ওপর তোমার দলের এমএলএ, এমপিদের বাঁচানোর ভার দিয়েছিলে, আমরা তাদের সামনেই তোমার দলের নেতাদের জুতো মেরে, পাথর ছুঁড়ে আধমরা করে দিয়েছি। চাইলে আমরা রাজ্যের যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময়, তোমাদের যে কাউকে মেরে ফেলতে পারি। তুমি আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না। তোমার এই হাই সিকিউরিটি নামক বস্তুটি আমাদের কাছে একটি ঢপের চপ'।

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে আজ চলছে মধ্যযুগীয় ইসলামি শাসন। কিন্তু দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ভূমিকা কী? ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা কী পদক্ষেপ নিয়েছে? বাঙ্গালি হিন্দু দিন প্রতিদিন আক্রমণের শিকার। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাদের মিছিল আক্রান্ত হচ্ছে। রাজ্যের পুলিশ মারছে, জেহাদিরা মারছে। তবু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক চুপ। কেন, পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের বাইরে? কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন এর বিরুদ্ধে মানুষকে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে হবে। অদ্ভুত তত্ত্ব! সাধারণ মানুষকে যদি জেহাদি গুন্ডাদের বিরুদ্ধে লড়তে হয় তবে তাঁরা কী করবেন? তাদের ভোট দিয়ে ওই চেয়ারে বসানো হয়েছে কেন? সাধারণ নাগরিকদেরই যদি প্রতিরোধে নামতে হয়, তবে আইন, বিচার ব্যবস্থা এসবের দরকার কী? সংবিধানে ৩৫৫, ৩৫৬ এই ধারা এগুলি আছে কী করতে? যে রাজ্যে সাংসদ সুরক্ষিত নয়, বিধায়ক সুরক্ষিত নয়, সেখানে সাধারণ মানুষ কোন সাহসে ওই নরখাদকদের সঙ্গে লড়াই করবে? তাদের জীবন, মা-বোনের সুরক্ষা কে দেবে?

ক'বছর আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার সময় আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। সেদিন হয়তো তাঁর লজ্জা লেগেছিল। সেজন্য হয়তো তিনি ধীরে ধীরে দলের এমপি, এমএলএ, নেতা-নেত্রী, কর্মী সবাইকে মার খাইয়ে নিচ্ছে, যাতে কেউ তাকে মার খাওয়ার জন্য টিটকিরি দিতে না পারে। কিন্তু দেশের কর্ণধারদের জেনে রাখা প্রয়োজন, এই পশ্চিমবঙ্গই ভারতকে রক্ষার একমাত্র গ্যারান্টি। কেন্দ্রের চরম অবহেলাতেই আজ এই পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশি জেহাদি ও রোহিঙ্গাদের 'সেফ শেলটারে' পরিণত হয়েছে। এই রাজ্য তারা ভারত দখলের করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। জেহাদিরা সফল হলে অদূর ভবিষ্যতে দিল্লি, মুম্বাই, গুজরাটও শান্তিতে থাকতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গের চিকেন নেক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের প্রাণ ভোমরা। চিকেন নেক লাগোয়া বিহারের কিষাণগঞ্জ ইতিমধ্যেই আসাদউদ্দিন ওয়েসির দৌলতে জেহাদিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ না বাঁচলে কারও রক্ষা নেই।

তাই দেরি করলে হবে না। কেন্দ্রকে এক্ষুণি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইতিমধ্যেই এসআইআর নিয়ে রাজ্য শাসকদলের নেতারা প্রকাশ্যে দাঙ্গা করার, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। কারণ তারা জানেন এই রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি মুসলমানরা তাদের ভোটব্যাংক। তারা সংখ্যায় দেড়-দু কোটিরও বেশি। এরা না থাকলে শাসক দলের ক্ষমতায় ফেরা অসম্ভব। তাই এদের নিয়ে শাসক দল পথে নামছে। কেন্দ্র সরকার গত ১০-১২ বছরে এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এসআইআর-এর নামে হিংসা ছড়ানো জেহাদি ও তার সমর্থকদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে হবে। প্রয়োজনে ৩৫৬ ধারা জারি করতে হবে। এটাই এদের জন্য উপযুক্ত। না হলে এই ধারাটি সংবিধানে আছে কী করতে? খনার বচনে বলে 'আছে গোরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল'। অর্থাৎ ঘরে বলদ আছে, কিন্তু তারা হাল বইতে পারে না, বসে বসে শুধু খায়। এমন বলদ পুষে চাষির লাভ কী? সংবিধানের যে ধারা দেশকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না, তার নাগরিককে বাঁচাতে পারে না, এমন ধারা সংবিধানের রেখে কী লাভ? ২০১৯ থেকে বাঙ্গালি হিন্দু তারা প্রতিটি নির্বাচনে বারে বারে কেন্দ্র সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন জুগিয়েছে, মুখ চেয়ে বসে আছে এই ভেবে কেন্দ্র তাদের রক্ষা করবে। এখন কেন্দ্র সরকাকেই প্রমাণ করতে হবে যে তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখা উপযুক্ত কিনা। ২০২৬-ই হয়তো শেষ সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া হলে আগামী দিনে এই পশ্চিমবঙ্গে ভারতমাতার জয়ধ্বনি দেওয়ার লোক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। □

জাতির স্বাভিমানের প্রতীক ব্যক্তিজীবনে ‘স্ব’-এর অভিব্যক্তি

রাজদীপ মিশ্র

প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন। ২০২৫ সালের বিজয়া দশমীতে সঙ্ঘ তার রাষ্ট্র সেবার যাত্রাপথ শতবর্ষ পূর্ণ করল। এটি নিছক একটি সংগঠনের শতবর্ষ নয়। এটি একটি চিন্তনের শতবর্ষ— একটি আদর্শের শতবর্ষ।

সঙ্ঘের লক্ষ্য হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করে দেশকে পুনরায় বৈভবশালী করা। সঙ্ঘ চায় ব্যক্তিজীবনের সংস্কার। ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তনের মাধ্যমেই প্রতিটি পরিবার সংস্কারিত হবে এবং তার ফলে সমাজ সংস্কারিত হবে। সংস্কারিত সমাজই তার দেশ তথা রাষ্ট্রকে সংস্কারিত করতে পারে। কাজেই ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তনের ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে সঙ্ঘ তার শতবর্ষে পাঁচটি পরিবর্তনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সেগুলি হলো— ব্যক্তি জীবনে ‘স্ব’-এর অভিব্যক্তি, পরিবার জীবনে মূল্যবোধ নির্মাণ, সামাজিক সমরসতা, নাগরিক জীবনে কর্তব্যবোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা। সমাজের সজ্জন শক্তির সহযোগে এই পাঁচটি বিষয়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রতিটি মানুষের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বিশেষ আহ্বান জানাবেন। এই ৫টি বিষয়কে ‘পঞ্চপরিবর্তন’ বলা হয়েছে। এই নিবন্ধে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে ‘স্ব’-এর অভিব্যক্তি বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হলো।

ভারতবাসী ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু স্ব-তন্ত্র লাভ করতে পারেনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে ‘স্ব-তন্ত্র’-এর অভাবে ভারত তার নিজস্ব জীবনমূল্যের আধারে দেশ গঠন করতে পারেনি। ব্যক্তি জীবনে এবং দেশবাসীর জীবনে ‘স্ব’-এর অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেনি। এর ফলে স্বাধীনতার বহু বছর পরও উন্নয়ন বা বিকাশের সমৃদ্ধি ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়েছিল। ‘স্ব’-ভাব জাগ্রত হলে ভারত তার সম্পূর্ণ শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে শুধু যে দাঁড়াতে পারে তাই নয়; বরং সম্পূর্ণ পৃথিবী ও মানবসভ্যতার পথপ্রদর্শক হতে পারে। বর্তমান ভারত বহু ক্ষেত্রে তার প্রমাণ রাখতে শুরু করেছে। দৈনিক ব্যবহার্য দ্রব্য থেকে

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের গূঢ় বিষয় পর্যন্ত, সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে শুরু করে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্র পর্যন্ত স্ব-ভাবের জাগরণ আবশ্যক। প্রয়োজন সকলের মধ্যে ভারতীয়ত্ব বোধ জাগরণ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিনোবাভাবে, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী এবং অন্য অনেক ছোটো-বড়ো সংগঠন ও ব্যক্তি এই স্ব-ভাব বা নিজস্বতাবোধ জাগরণের বিষয় নিয়ে ভেবেছেন এবং কাজও করেছেন। পরিণতি স্বরূপ ১৯৯১ সালে 'স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ' নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছে।

স্বদেশির অর্থ দেশভক্তির জাগরণ; যা কিছু দেশীয়— তার সর্বাত্মক প্রচলন। ভারতীয় সমাজের উচ্চ জীবনমূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আদর্শের প্রতি সম্মান সর্বোপরি। 'স্ব' বিস্মরণের অর্থ আত্মবিশ্বাস হারানো। 'স্ব' ও স্বদেশি গ্রহণের অর্থ হলো 'আত্মবিশ্বাসের প্রকটীকরণ'। নিজের ওপর বিশ্বাস, নিজ সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর বিশ্বাসের নামই হলো স্ব-ভাবের জাগরণ। এই ভাব জাগরণের ফলেই ভারতবাসী পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল।

ব্যক্তি জীবনে 'স্ব'-এর অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটাতে হবে। নিজের জীবন ও ব্যবহারে তা আনতে হবে। দেশকে মহান করার জন্য স্ব-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যক। দেশের প্রগতি পরানুকরণের মাধ্যমে হতে পারে না, রাষ্ট্রবোধের দ্বারাই সম্ভব হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষরা দেশের প্রকৃতি, সমাজ এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশের মানুষের জীবনশৈলী বিকশিত করেছিলেন। পরাধীনতার কালে বহিরাগত আক্রমণকারীরা ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জীবনশৈলীকে ধ্বংস করে ফেলে তাদের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এরজন্য তারা বলপ্রয়োগ করতে পিছপা হয়নি। ভয়ে, লোভে সেই সময় বহু মানুষ বিদেশি সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। তার ফলে তারা রাষ্ট্রবিরোধীও হয়ে গিয়েছে। এখনো তারা এই দেশে থেকে এই দেশেরই বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। সেজন্যই স্ব-ভাব জাগরণের প্রয়োজন পড়েছে। এর বহু দিকের কয়েকটি হলো—

(১) **স্ব-ভাষা :** মাতৃভাষার ব্যবহার বাড়ানো তথা বিনা প্রয়োজনে বিদেশিভাষার ব্যবহার কমানো। দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের স্বাক্ষর মাতৃভাষায় করা প্রয়োজন। নিজ ভাষায় আত্মীয়তাপূর্ণ সম্বোধন সূচক শব্দ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

(২) **স্ব-ভূষা :** দেশীয় পোশাকের ব্যবহার বাড়ানো। সবসময় না হলেও বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান বা উৎসবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পন্ন পোশাক পরিধান আবশ্যক।

(৩) **স্ব-ভোজন :** বাড়িতে তৈরি খাবার খাওয়া। পিৎজা, বার্গারের বদলে স্বাস্থ্যকর ভারতীয় খাবার গ্রহণীয়। বাইরে তৈরি খাবার যেমন ফাস্টফুড (যা অধিকাংশ সময়েই অস্বাস্থ্যকর ভাবে তৈরি করা হয়) বর্জন করতে হবে। বাড়ির সবাই মিলে বাইরে খেতে যাওয়া এখন একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এই অভ্যাস ধীরে ধীরে বন্ধ করতে হবে।

(৪) **স্ব-ভজন :** বাড়িতে আরাধ্য দেবতার সামনে পরিবারের সবাই একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের কীর্তন বা ভজন গাওয়া প্রয়োজন। এতে বাড়ির ছোটোরাও অংশগ্রহণ করবে। কারণ শ্রবণ ও দর্শনশুদ্ধি একটি বড়ো আধ্যাত্মিক বিষয়। এর মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাবনার পথ উন্মোচিত হয়।

(৫) **স্ব-ভবন :** আমাদের বাসগৃহ যেন হিন্দু সংস্কৃতিসম্পন্ন রুচিবোধের পরিচায়ক হয়। বাস্তুরীতি মেনে বসতবাড়ি নির্মাণ, বাড়িতে তুলসীমঞ্চ বা অন্যান্য মাঙ্গলিক চিহ্ন থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। বাড়িতে আরাধ্য কুলদেবতা বা দেবীর প্রতিকৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৬) **স্ব-ভ্রমণ :** সপরিবারে দেশের মধ্যেই কোথাও বেড়াতে যাওয়া। এমন কোথাও বেড়াতে যাওয়া উচিত যার 'স্থান মাহাত্ম্য' রয়েছে। যেমন, কোনো দেবদেবীর মন্দির, শক্তিপীঠ, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, চারধাম ইত্যাদি আধ্যাত্মিক স্থান, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানকারী বিভিন্ন বিপ্লবী বীরদের জন্মস্থান বা ঐতিহাসিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও ভ্রমণ করে আমরা নিজেদের ইতিহাস এবং আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, প্রাচীন শিল্পকলা ও ঐতিহাসিক স্থানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারি।

এছাড়াও (১) নিজেদের ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, সাহিত্য, কলা, দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং সেই প্রাচীন অমূল্য বিষয়গুলি সম্পর্কে নিজের গর্ববোধ জাগ্রত করা এবং পরিবারের সবার মধ্যে সেই বোধকে অনুভব করানো।

(২) **স্বদেশি সামগ্রী ব্যবহার :** যেসব দ্রব্য ভারতে উৎপাদিত হয়, সেগুলির ব্যবহার করা। বিনা প্রয়োজনে বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার না করা। স্মরণে রাখা— 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই/দীন দুখীনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।'

(৩) স্থানীয়ভাবে যেসব জিনিস উৎপাদিত হয়, সেগুলির ব্যবহার করা। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় 'ফর লোকাল ভোকাল।'

(৪) দীর্ঘদিনের পরাধীনতার চিহ্ন মুছে ফেলা। রাস্তা, ভবন, রেলস্টেশন, বিমানবন্দর ইত্যাদির নাম বিদেশি আক্রমণকারীদের নামে না রাখা। ভারতীয় শৈলীর সঙ্গে মানানসই কোনো নাম রাখা।

(৫) আমাদের শুভ জন্মদিন হিন্দু সংস্কৃতি অনুযায়ী পালন করা। সেদিন কোনো মন্দিরে পূজা দেওয়া, প্রদীপ জ্বালানো, ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা ইত্যাদি।

(৬) বাড়ির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র নিজভাষায় লেখা।

(৭) বাড়ির নামের ফলক নিজভাষায় লেখা।

(৮) স্বদেশি অর্থব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া।

(৯) স্বরাষ্ট্র, স্বধর্ম, স্বরাজ— এই বিষয়ে স্বাভিমান বোধ থাকা।

(১০) দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার করা এবং অন্যকে এই বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া। উদাহরণ— অপারেশন সিঁদুর।

যে কোনো দেশে উন্নয়নের জন্য সেই দেশের নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতেই উন্নয়নের পথ সুগম করা উচিত। 'স্বদেশি অর্থনীতি' হওয়া উচিত রাষ্ট্রজীবনের চালিকাশক্তি। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক— উভয় ক্ষেত্রে নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়ানোই হলো স্বনির্ভর জীবন। পরাধীনতার মানসিকতা সর্বপ্রকারে মন থেকে মুছে ফেলে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্তরে স্বদেশি জীবনশৈলী গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজনীয়, তবেই ভারত আত্মনির্ভর হতে পারবে।

(লেখক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ)

উন্নত দেশের আবশ্যিক শর্ত নাগরিক শিষ্টাচার পালন

রামদত্ত চক্রধর

মনুষ্যজীবনে সংস্কার প্রকাশের অন্যতম দিক হলো— সুস্থ সামাজিক আচরণ এবং তার ব্যবহার। মানুষ স্বভাবতই সামাজিক প্রাণী। তাই সমাজে সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য, সহযোগিতা এবং পরস্পর শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে কিছু নিয়ম ও বিধি প্রণীত হয়েছে। সেগুলি পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। প্রাচীন যুগে মানুষ নিজের বিবেক ও ন্যায়ের বোধে পরিচালিত হয়ে অত্যন্ত শিষ্টাচারপূর্ণ জীবনযাপন করে এক উন্নত সমাজ জীবন গড়ে তুলেছিল। তখন না ছিল কোনো রাজা, না শাসন, না দণ্ড। তখন সমাজ টিকে ছিল পারস্পরিক ধর্ম ও ন্যায়ের ভিত্তিতে। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ রয়েছে—

'ন রাজ্যং ন রাজাসীৎ ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ।
ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বাঃ রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্।।'

আজকের দিনে সমাজের স্থিতি ও শৃঙ্খলার জন্য আইন অপরিহার্য। আমরা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক, তাই সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত আইন, অধিকার ও কর্তব্যগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা আমাদের দায়িত্ব। নাগরিক শিষ্টাচারের মূল কথা হলো— কর্তব্য বোধ থেকে নিয়ম মেনে চলা, ভয় থেকে নয়।

যানচলাচল সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখতে কিছু মৌলিক নিয়ম মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। ট্র্যাফিক সিগন্যাল মানা, মোটরবাইক চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার করা, রাস্তার মোড়ে অকারণে হর্ন না বাজানো, গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই সিটবেল্ট বাঁধা— এইসব অভ্যাস কেবল নিজের নয়, অন্যের নিরাপত্তার সঙ্গেও সম্পর্কিত। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে রাখা এবং সময়মতো তার নবীকরণ করা জরুরি। একইভাবে মোটরবাইকে দুইয়ের বেশি আরোহী না নেওয়া। এসব নিয়ম মানা শুধুমাত্র পুলিশ বা দণ্ডের ভয়ে নয়, বরং নিজের কর্তব্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্বের কারণে হওয়া উচিত।

পরিচ্ছন্নতা রক্ষা একটি সভ্য সমাজের মূল দায়িত্ব। বাড়ি, রাস্তা, অফিস, সার্বজনিকস্থল, ট্রেন ও বাসে ভ্রমণের সময় কিংবা উৎসব, মেলা, ধর্মীয় স্থান, পুকুর ও নদীতে স্নানের সময়— সর্বত্র পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা প্রয়োজন। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিবেশকে পরিষ্কার রাখি, তাহলে সমাজ ও দেশও পরিচ্ছন্ন হবে।

একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিয়মিত কর ও শুল্ক প্রদান করা আমাদের কর্তব্য। আয়কর, গৃহকর, ব্যবসায়িক কর, টোল ট্যাক্স, বিদ্যুৎ বিল— এগুলি আয়ের অনুপাতে সময়মতো সরকারের কাছে জমা করা সমাজের অগ্রগতি ও দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অবৈধ দখল বা নির্মাণ না করাও নাগরিক শিষ্টাচারের অংশ। দোকান, বাড়ি বা বহুতল নির্মাণে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সকলেরই কাজ করা উচিত।

বিবাহ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে অস্থায়ী নির্মাণ বা বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ম মেনে করা প্রয়োজন। অনুমতি ছাড়া রাস্তা দখল করা, বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার বা অনুমোদনবিহীন স্থাপনা নির্মাণ শুধু আইনবিরোধী নয়, সামাজিক দায়িত্বহীনতারও প্ররিচায়ক। এসব ছোটো ছোটো নিয়মই একত্রে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সচেতন সমাজ গড়ে তোলে। নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য শুধুমাত্র অধিকার ভোগ নয়, বরং কর্তব্য পালন ও শিষ্টাচার রক্ষা করা। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে এক সভ্য, সুরক্ষিত ও সুন্দর সমাজ।

সভ্য আচরণের অন্যতম পরিচায়ক হলো নিজের দেওয়া সময় রক্ষা করা। কোনো সভা, অনুষ্ঠান বা বক্তৃতার সময় নির্ধারিত সময়ে শেষ করা আমাদের দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলার প্রতিফলন ঘটায়। নাগরিক হিসেবে 'ভোটাধিকার প্রয়োগ'-ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের সময় ভোট দেওয়া প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। যেখানে ভোটের উপস্থিতি কম, তা নাগরিক সচেতনতার অভাব প্রকাশ করে। তাই সবাইকে নিজ উদ্যোগে শতভাগ ভোট প্রদানে অংশ নিতে হবে।

সাধারণ সমাজে 'নিজের পালার অপেক্ষা' করা সামাজিক শৃঙ্খলার চিহ্ন। বাসে উঠার সময়, রেলগেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা, রাস্তায় ওভারটেক না করা, বাজারে বা অন্যত্র গাড়ি ঠিক জায়গায় পার্ক করা— এসব আচরণ আমাদের দায়বদ্ধ নাগরিক পরিচয়ের প্রকাশ।

'সার্বজনীন সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষা'-ও নাগরিক শিষ্টাচারের অংশ। এর ফলে ঐতিহাসিক স্থাপনা, পর্যটন কেন্দ্র ও সাধারণ সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ হয় এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও সম্মান 'জাতীয় প্রতীক ও উৎসবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন'-ও প্রকাশ

পায়।

জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় প্রতীক, স্মারক এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের নাগরিক দায়িত্বের অংশ।

'আপদকালীন সহযোগিতা'-ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্যোগের সময় সরকার ও সমাজের সঙ্গে সহযোগিতা করে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে অংশ নেওয়া প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।

নাগরিক শিষ্টাচারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'পরিচয়পত্র সময়োপযোগী রাখা'। পরিচয়পত্র, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড ইত্যাদি সবসময় আপডেট রাখা প্রয়োজন।

পরিবেশ সচেতনতাও নাগরিক দায়িত্বের অংশ। 'জল ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ' করতে হবে। অপ্রয়োজনে বিদ্যুৎ ও জল ব্যবহার করা উচিত নয়, শব্দ ও বায়ুদূষণ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। 'স্থানীয় সমাজে সহযোগিতা'-ও শিষ্টাচারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রামসভা, মহল্লা সমিতি বা আবাসিক সমিতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা সমাজে স্নেহের ভাব বৃদ্ধি করে।

বর্তমান সময়ে 'সামাজিক মাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার' অপরিহার্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেবল ইতিবাচক, সত্য ও সমাজোপযোগী বিষয়বস্তু প্রচার করা উচিত। যাচাই না করে কোনো তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া সচেতন নাগরিকের কাজ নয়। সাধারণ শিষ্টাচারের মধ্যে আসে ট্রেনে বা বাসে রাতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, গান শোনা, হাসপাতাল বা অন্যান্য শান্ত পরিবেশে অযাচিত শব্দ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

সবশেষে, নাগরিক শিষ্টাচারের মূল বক্তব্য হলো অন্যের অনুভূতি বা অধিকারের ক্ষতি না করা। এই নিয়মগুলি মেনে চললে একটি সচেতন ও সভ্য সমাজ গড়ে ওঠে, যা সকলের জন্য নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিত করে এবং তার ফলে বিশ্বদরবারে দেশ সম্মানের পাত্র হয়ে ওঠে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ)

সঙ্ঘ শতবর্ষে পঞ্চপরিবর্তনের একটি পরিবার প্রবোধন

সারদা প্রসাদ পাল

একজন স্বয়ংসেবক পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীকে প্রশ্ন করেছিলেন সঙ্ঘের ও স্বয়ংসেবকদের লক্ষ্য পরমবৈভবশালী রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন কবে পূর্ণ হবে?

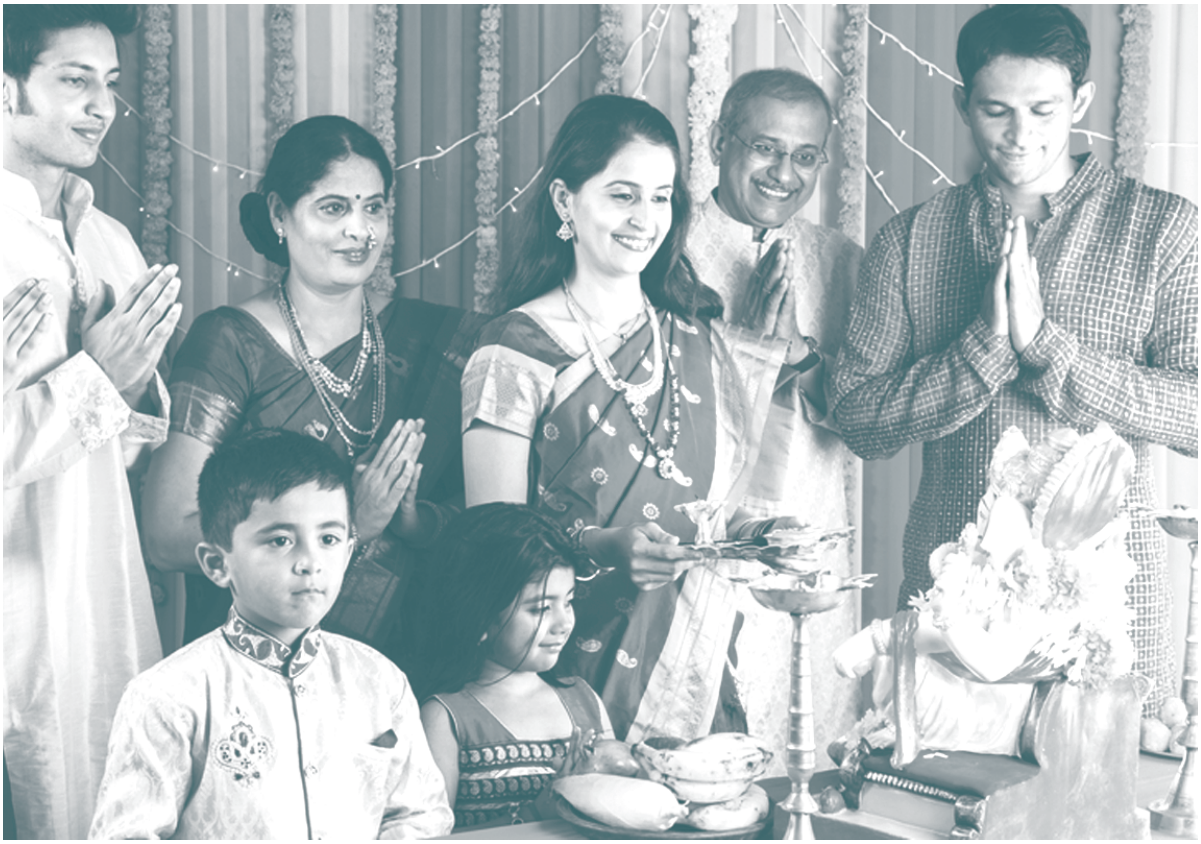

উত্তরে তিনি বলেন অতি শীঘ্রই আমাদের দেশ ভারতবর্ষ পরম বৈভবসম্পন্ন হবে। সেই অবস্থায় পৌঁছতে গেলে হিন্দু সমাজকে তার ধারক হতে হবে। তাই সমাজকে প্রস্তুত করতে হবে। সেই সমাজ তখনই প্রস্তুত হবে যখন সমাজের প্রতিটি পরিবার বর্ধিষ্ণু ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। এই বিষয়কে মাথায় রেখে শতবর্ষে সঙ্ঘের কার্যকর্তারা পঞ্চ পরিবর্তনের মধ্যে পরিবার প্রবোধনকে রেখেছেন।

বিশ্বের অন্যান্য দর্শন এই বিশ্বকে বাজার হিসেবে দেখলেও হিন্দু দর্শন বিশ্বকে পরিবার হিসেবে মনে করে। আমাদের সমাজের যা কিছু গুণসম্পন্ন বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে অন্যতম উত্তম ব্যবস্থা পরিবার পরম্পরা। এই পরিবার ব্যবস্থা কবে থেকে শুরু তার হিসেব করা যাবে না। তবে মহাউপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায় ৭১ থেকে ৭৩ শ্লোকে বলা হয়েছে :

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।

উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।

পরিবারের আর একটি উদাহরণ শোনা যায়, যম-যমুনার শ্লোকে। সেখানে যম তাঁর বোন যমুনাকে বলছে, এই চরাচরে কোনো নারী পুরুষকে পুরুষ হিসেবে দেখার পরিবর্তে পিতা, পুত্র বা ভ্রাতার দৃষ্টিতে দেখলে অথবা পুরুষ কোনো নারীকে নারী হিসেবে না দেখে নিজের মা বা ভগ্নী হিসেবে দেখলে তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণতা লাভ করবে। এই উপলব্ধি থেকেই পরিবারের সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যুগে এখনও এই পরিবার ব্যবস্থা এত ভালো আছে যে ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার মীরাটের একট পরিবার কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন। তিনি এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে দেশে ফিরে বলেছিলেন, ব্রিটেনের

সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থাকে এখানে চালু করতে হবে।

ভারতে হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব। হিন্দু পরিবার বলশালী হলে সমাজ তথা রাষ্ট্র বলশালী হবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা বন্ধন গড়ে উঠে। বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং ছোটোদের প্রতি ভালোবাসার যে টান অনুভূত হয় তাতেই বন্ধন আরও দৃঢ় হয়ে উঠে। কবির কথায় বললে এরকম : আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।।

শ্রদ্ধা কেমন হয় তার একটি উদাহরণ : তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা। বড়লাট কার্জন বাঙ্গলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জিকে ইংল্যান্ডে গিয়ে সরকারের কিছু কাজ করে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য একটা ডিগ্রিও নিয়ে আসার অনুরোধ করেছিলেন। স্যার আশুতোষের যাতায়াতের ভার বহন করবে সরকার। আশুতোষবাবু বললেন ঠিক আছে আগে মায়ের অনুমতি পাই তারপর বলব। শুনে কার্জন সাহেব রেগে গিয়ে বলেছিলেন, আপনি কী মনে করেন? আমি ব্রিটিশ-ভারত সরকারের প্রধান, আপনার মা কি আমার থেকেও বড়ো?

উত্তরে আশুতোষবাবু বললেন যে আমার মা আমার কাছে সবার থেকে বড়ো। এমনকী ঈশ্বরের থেকেও। আর ভালোবাসার উদাহরণ— একবার গান্ধীজী টেগোর হিলে গেছিলেন। তিনি টিলার উপর থেকে দেখলেন একটি বাচ্চা মেয়ে একটি শিশুকে নিয়ে টিলার উপরে চড়ছে। শিশুটির চেহারা মেয়েটির থেকে অনেক ভারী। উপরে উঠতে মেয়েটির বেশ কষ্ট হচ্ছে। উপরে ওঠার পর মেয়েটিকে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন, কি কষ্ট হলো তো? মেয়েটি একগাল হেসে বলল, কষ্ট হবে কেন? এতো আমার নিজের ভাই। যেহেতু নিজের ভাই তাই কষ্ট হয় না। নিজের ভাই হলো আদরের।

সমাজ পরিবর্তনের আগে নিজের পরিবারে এই ভাব আনতে হবে। বর্তমানে পরিবারের সদস্যরা বিশ্বের নানা প্রান্তে থাকে। তাদের সঙ্গে সবসময় কথা হয় না, দেখাসাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল সদস্য প্রত্যেকে ভালোবাসার টানে বাধা থাকে। সেই ব্যবস্থা করতে হবে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার সময় মাতৃভাষায় কথা বলা, বছরে একবার একজায়গায় জড়ো হওয়া, কুলদেবী দর্শন করতে যাওয়া। এই কারণে অষ্টাঙ্গ মার্গের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে— যেমন, ভূত, ভবিষ্যৎ, ভাষা ভূষা, ভজন-ভোজন, ভবন-ভ্রমণ।

নিজের পরিবারকে সামাজিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে তোলার জন্য সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। মুক্তসমাজ তৈরি করতে হলে নিজের পরিবারকে সর্বপ্রথম সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। যাদের সাহায্যে প্রতিদিন আমাদের দিনানিপাত হয় অর্থাৎ সেই সাফাই কর্মী, যারা চুল কাটে, যারা কাপড় কেচে দেয়, জুতা সেলাই করে দেয়, আমাদের পোশাক ইস্ত্রি করে দেয়, তাদের নিজের বাড়িতে ডেকে পরিবারের সবার সঙ্গে সহভোজ করা প্রয়োজন।

সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় বালাসাহেবজী বলতেন অস্পৃশ্যতা যদি পাপ না হয় তবে পৃথিবীতে আর কোনো পাপ নেই। তিনি এটা শুধু কথার কথা বলেননি। নিজের পরিবারে এটি প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে অস্পৃশ্যতা মুক্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে গর্ব অনুভব করতেন।

পাশ্চাত্য দর্শন বলে সমাজ Maximum Good of Maximum People-এর কথা। কিন্তু আমরা Maximum-এ বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাসী সর্বে। তাই বলি সর্বে সন্তু নিরাময়ের কথা। এই ব্যবস্থা আমাদের সমাজে চালু ছিল। তাই যারা ভিক্ষা করতে বাড়িতে আসে তাদের বলি ভিক্ষা নয়, আদায়ে এসেছে। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যের হাত দিয়ে তার কাছে সাহায্য পাঠাই যাতে সমাজের জন্য কিছু করার ভাব ছোট্ট সদস্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। শতবর্ষে সঙ্ঘ চায় স্বয়ংসেবক এবং তার পরিবারের মাধ্যমে এই সংস্কারের বিস্তৃতি হোক। তবেই পরিবার যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হবে। আমাদের দেশ পরমবৈভবশালী হবে।

'মা'কে কেন্দ্র করে আমাদের পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যতই হিন্দু বিরোধীরা বলুক যে হিন্দু সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের কোনো সম্মান ছিল না তাঁদের কোনো বিশেষ ভূমিকা ছিল না, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে তাঁরাই সংসার প্রতিপালনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মা কেমন ছিলেন? একটা উদাহরণ দিই। সবাই এখন একটা শব্দের সঙ্গে খুব পরিচিত, সেটা AI অর্থাৎ Artificial Intelligence। পরিবারে মা হলেন N.I. Natural Intelligence অর্থাৎ শুধু সন্তানেরা নয় পরিবারের কার কী অসুবিধা সেটা খাবার হোক বা অন্য কিছু, সমস্ত বিষয়ে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। তারা কিছু বলার আগেই সমস্যার সমাধান করে দেন তাঁরা। সেই জন্য আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা বন্ধন তৈরি হয় 'মা'কে কেন্দ্র করে।

পারিবারিক স্তরে চেতনা জাগরণের আবশ্যক সিঁড়ি হলো পরিবার প্রবোধন। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হলো পরিবার ব্যবস্থা। সমাজের ক্ষুদ্রতম স্বরূপ পরিবারে অনুভব করা যায়। বলা হয় সংস্কার প্রদানের প্রথম পাঠশালা হলো পরিবার।

১. সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন একসঙ্গে ভোজন করা।

২. মাসে অন্তত ১/২ বার পরিবার-সহ নিকটবর্তী মন্দিরে যাওয়া।

৩. মাসে একবার পারিবারিক বৈঠকের আয়োজন করা।

৪. পরিবারের পরম্পরা জানা।

৫. অন্তত পাঁচ পূর্বপুরুষের পরিচয় জানা।

৬. ভোজনের সময়ে ইলেক্ট্রনিক্স উপকরণ ব্যবহার না করা।

৭. সপ্তাহে অন্তত একদিন বাড়িতে পূজাঘরে একসঙ্গে উপস্থিত হওয়া।

৮. সপ্তাহে অন্তত একদিন শিশুদের সঙ্গে মহাপুরুষ জীবনী আলোচনা করা।

৯. পরিবারের সকলে একসঙ্গে গীতাপাঠ করা বা ভজন করা বা সুভাষিত (শ্লোক) বলা।

১০. ইলেক্ট্রনিক্স উপকরণ, দূরদর্শন, দূরভাষ, কম্পিউটারের ব্যবহার না করে সপ্তাহে ১/২ ঘণ্টা একসঙ্গে বসে গল্প করা।

১১. নিজের বংশের ব্যক্তির দ্বারা কৃত ভালো কাজের আলোচনা করা। ◻

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষের যাত্রায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিন

প্রবীর কুমার মিত্র

কোনো পরিবারে যখন শিশুর জন্ম হয় তখন পরিবারের সদস্যরা তার দেখাশোনা করে। ঠিক সময়ে অন্নপ্রাশন, নামকরণ, শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদির দ্বারা সংস্কারিত করা হয়। ঠিক সেইরকম ভারতবর্ষে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের মস্তিষ্কপ্রসূত এক সংগঠনের জন্ম হয়। দিনটি ছিল বিজয়াদশমীর দিন (২৭.০৯.১৯২৫)। পরিবারের সকল সদস্য একত্রিত হয়ে সেই সংগঠনের দেখাশোনা শুরু করে। ছয় মাস একুশ দিন পর ১৭.০৪.১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে এই সংগঠনের নামকরণ সংস্কার হয়। ২৫ সদস্যের মধ্যে ২০ জন সদস্যের সম্মতিক্রমে নামকরণ সংস্কার করা হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। ২৮.০৫.১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরের মোহিতেওয়াড়ার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে দৈনিক শাখা রূপে অন্নপ্রাশন আয়োজন হয় (হিন্দু সমাজের সম্মুখে প্রদর্শন করা হয়)। ১৯২৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সরসঙ্ঘচালক হিসেবে অভিভাবকত্ব স্বীকার করে উপনয়ন সংস্কার করান। ০৩.০৭.১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে গুরুরূপে গৈরিকধ্বজকে স্বীকার করে গুরুদক্ষিণা সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা শুরু হয়। মৌন গুরুর সামনে আত্মনিরীক্ষণ এবং আত্ম-সংশোধনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য, আত্মবিশ্বাস অর্জন করার লক্ষ্যে, আত্মসমর্পমের জন্য তৎপর স্বয়ংসেবক নির্মাণের কাজ নিয়মিত রূপে চলতে থাকে। দেশে এক অভিনব কার্যশৈলীর অভিনব সংগঠন প্রাকৃতিক ক্রমে বিকাশের এক অভিনব উদাহরণ সমাজের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই সংগঠন এবছর বিজয়া দশমীর দিন শতবর্ষ পূর্ণ করছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিগত ১০০ বছরের গুরুত্বপূর্ণ দিবস।

২৭.০৯.১৯২৫ : নাগপুরে বিজয়া দশমীর দিন ডাক্তারজী কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে সঙ্ঘ স্থাপনার ঘোষণা করেন।

১৭.০৪.১৯২৬ : ডাক্তারজীর বাড়িতে বৈঠকে সঙ্ঘের নামকরণ করা হয়।

২৮.০৫.১৯২৬ : নাগপুরে মোহিতেওয়াড়ার মাঠে শাখা শুরু হয়।

১৯২৭ সালের মে মাসে ১৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রথম সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ (ওটিসি) শুরু হয়।

২০.০৪.১৯২৯ : নাগপুরে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর সঙ্গে ডাক্তারজীর সাক্ষাৎ হয়।

১০.১০.১৯২৯ : নাগপুরে মোহিতেওয়াড়ার সঙ্ঘস্থানে পূজ্য ডাক্তারজীকে সরসঙ্ঘচালক প্রণাম দেওয়া হয়।

২৬.০১.১৯৩০ : দেশের সমস্ত শাখায় স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়।

২১.০৭.১৯৩০ : যবতমালে (মহারাষ্ট্র) ডাক্তারজী জঙ্গল সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন।

১.২.১৯৩২ : মধ্যভারত শাসন দ্বারা সরকারি কর্মচারীদের সঙ্ঘে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়।

১৫.২৫.১২.১৯৩৪ : ওয়ার্ধা সঙ্ঘ শিবিরে গান্ধীজীর আগমন। পরেরদিন ডাক্তারজী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গান্ধীজীর নিবাস সত্যাগ্রহ আশ্রমে যান।

১৯৩৪ : সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার খড়্গপুরে রেলওয়েজ এমপ্লয়িদের নিয়ে শাখা শুরু করেন।

১.০৭.১৯৩৭ : সঙ্ঘকাজের জন্য ভাওরাও দেওরসজীকে লক্ষ্ণৌ পাঠানো হয়।

১২.১২.১৯৩৭ : ডাক্তারজী নাগপুরের শাখায় বীর সাভারকারকে স্বাগত জানান।

১৪.০১.১৯৩৮ : কানপুরে দীনদয়াল উপাধ্যায় স্বয়ংসেবক হন।

২০.০২.১৯৩৯ : সিন্দী গ্রামে আয়োজিত চিন্তন বৈঠকে প্রার্থনা, আজ্ঞা ও অন্যান্য রীতি নীতি নির্ধারণ হয়।

২৩.০৩.১৯৩৯ : বর্ষ প্রতিপদের শুভদিনে কলকাতায় ১নং সরকার লেনে শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের শাখা শুরু করেন।

১৭.০৬.১৯৩৯ : পুনের মিনার্ভা থিয়েটারে ডাক্তারজী দ্বারা চলচ্চিত্র 'ভগবা ঝান্ডা'র উদ্ঘাটন।

১৩.০৮.১৯৩৯ : নাগপুরে গুরুপূর্ণিমা উৎসবে ডাক্তারজী শ্রীগুরুজীকে সরকার্যবাহ ঘোষণা করেন।

২৩.০৪.১৯৪০ : পুনে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে প্রথম সংস্কৃত প্রার্থনা ও আজ্ঞার প্রয়োগ করা হয়।

২১.০৬.১৯৪০ : পূজ্য ডাক্তারজীর দেহাবসান।

ফঃ ৩

০৩.০৭.১৯৪০ : শ্রীগুরুজীকে সরসঙ্ঘচালক ঘোষণা ও সরসঙ্ঘচালক প্রণাম প্রদান করা হয়।

০৫.০৮.১৯৪০ : কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ভারত সুরক্ষা আইনের ৫৬ ও ৫৮ ধারা অনুসারে সঙ্ঘে সৈনিক বেশভূষা ও প্রশিক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়।

১৪.০১.১৯৪৭ : বিদেশে কেনিয়ায় প্রথম হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামে সংগঠন শুরু হয়।

০৫.০৮.১৯৪৭ : করাচীর ফায়ার ব্রিগেড ময়দানে শ্রীগুরুজীর অখণ্ড ভারতে শেষ ভাষণ।

১১-১২.০৯.১৯৪৭ : দিল্লির বিড়লা হাউসে শ্রীগুরুজী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৮.০৯.১৯৪৭ : দিল্লির ভাঙ্গি কলোনিতে নিজের বাসস্থানের পাশে একত্রিত ৫০০ স্বয়ংসেবককে গান্ধীজী সম্বোধিত করেন।

১৭.১০.১৯৪৭ : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আগ্রহে শ্রীগুরুজী সরকারি বিমানে শ্রীনগর যান। মহারাজা হরি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কাশ্মীরের ভারত-বিলয় নিশ্চিত করেন।

০৮.০১.১৯৪৮ : সর্দার প্যাটেল সঙ্ঘের প্রশংসা করেন।

০১.০২.১৯৪৮ : গান্ধীহত্যার মিথ্যা অজুহাতে শ্রীগুরুজীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

০৪.০২.১৯৪৮ : সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত ঘোষণা করেন।

২৬.০৫.১৯৪৮ : গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের আইনি বিচার শুরু হয়।

০৯.১২.১৯৪৮ : ভাইয়াজী দানী দিল্লিতে সত্যাগ্রহ শুরু করেন।

১০.০১.১৯৪৯ : গান্ধী হত্যাকাণ্ডের বিচারে সঙ্ঘ সমস্ত রকম দোষারোপ মুক্ত হয়।

১২.০৭.১৯৪৯ : সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হয়।

১৩.০৭.১৯৪৯ : শ্রীগুরুজী বৈতুল জেল থেকে মুক্ত হন।

২২.১১.১৯৫২ : জম্মুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ১৫ জন স্বয়ংসেবকের মৃত্যু হয়।

০২.০৪.১৯৬২ : নাগপুরে রেশিমবাগে স্মৃতিমন্দিরের উদ্ঘাটন হয়।

২৬.০১.১৯৬৩ : দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যোগদান করেন।

২৫.০৩.১৯৭৩ : অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় শ্রীগুরুজীর শেষ ভাষণ।

০৫.০৬.১৯৭৩ : শ্রীগুরুজীর প্রয়াণ।

০৬.০৬.১৯৭৩ : শ্রীবালাসাহেব দেওরস তৃতীয় সরসঙ্ঘচালকরূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৩.০৫.১৯৭৫ : কালিকট সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে জয়প্রকাশ নারায়ণ আসেন।

০৪.০৭.১৯৭৫ : সঙ্ঘের উপর দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

১৪.১১.১৯৭৫ : লোক সংঘর্ষ সমিতির নামে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়।

২২.০৩.১৯৭৭ : সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

০৫.০৩.১৯৭৮ : নাগপুরে শ্রীগুরুজী স্মৃতিচিহ্ন উদ্ঘাটন হয়।

১৯৮৫ : সঙ্ঘের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জনজাগরণ অভিযান।

১৯৮৯ : ডাক্তারজী জন্মশতবর্ষে রাষ্ট্রব্যাপী সম্পর্ক ও সেবা অভিযান হয়।

২৩-২৫.১০.১৯৮৯ : ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে নাগপুরে বর্তমান ও পূর্বতন প্রচারকদের শিবির হয়।

১০.১২.১৯৯২ : বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের অভিযোগে সঙ্ঘের উপর তৃতীয় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

০৪.০৬.১৯৯৩ : ন্যায়ালয়ের নির্দেশে সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

০৮.০৮.১৯৯৩ : মাদ্রাজ কার্যালয়ে উগ্রপন্থীদের বোম বিস্ফোরণে পাঁচজন প্রচারক-সহ ১১ জনের মৃত্যু হয়।

১১.০৩.১৯৯৪ : অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ (রজ্জুভাইয়া) চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক নিযুক্ত হন।

১১.১২.১৯৯৫ : বালাসাহেব দেওরসজীর সহস্র চন্দ্রদর্শন কার্যক্রম।

০৬.০৮.১৯৯৯ : কাঞ্চনছড়া বনবাসী কল্যাণ আশ্রম (উত্তর ত্রিপুরা) থেকে চার কার্যকর্তাকে অপহরণ করা হয়। (১) শ্যামল সেন গুপ্ত, (২) সুধাময় দত্ত, (৩) দীপেন দে, (৪) শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

১০.০৩.২০০০ : সুদর্শনজী পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক নিযুক্ত হন।

১৮.০৭.২০০১ : ত্রিপুরা থেকে অপহৃত চার কার্যকর্তাকে হত্যা করা হয়।

২০০১ : সঙ্ঘের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্র জাগরণ অভিযান সঞ্চালিত হয়।

২৪.০২.২০০৬ : শ্রীগুরুজী জন্মশতাব্দী সমারোহের শুভারম্ভ হয়।

২০০৬ : শ্রীগুরুজী জন্মশতাব্দী বর্ষে রাষ্ট্রব্যাপী সামাজিক সমরসতা অভিযান হয়।

১৮.০২.২০০৭ : দিল্লিতে শ্রীগুরুজী জন্মশতাব্দী সমারোহের সমাপন হয়।

২১.০৩.২০০৯ : শ্রীমোহনরাও ভাগবত সঙ্ঘের ষষ্ঠ সরসঙ্ঘচালক নিযুক্ত হন।

২০০৯ : সর্বে দেবাঃ স্থিতা দেহে, সর্বদেবময়ী হি গৌঃ— এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে বিশ্ব মঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

২০১২ : মহান আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রব্যাপী পরিবর্তন প্রেরণা অভিযান হয়।

২০১৬ : সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ৯১ বছর পর সঙ্ঘের গণবেশ হাফ প্যান্টের পরিবর্তে ফুল প্যান্ট করা হয়।

২০২৫ : সঙ্ঘের শতাব্দী বর্ষে সঙ্ঘকে প্রত্যেক বাড়িতে, গ্রামে ও শহরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ষষ্ঠ মহান জনসম্পর্ক অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। ◻

বিকশিত ভারত গঠনের অন্যতম কারিগর **মাধবী লাথা**

সুতপা বসাক ভড়

দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত হলো কাশ্মীর উপত্যকা। পৃথিবীর উচ্চতম রেলসেতু চেনাব ব্রিজ দিয়ে ছুটে চলল বন্দেভারত এক্সপ্রেস। যাঁদের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার ওপর ভিত্তি করে এই সেতু নির্মিত হয়েছে, সেই দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা হলেন রক ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞ মাধবী লাথা। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের প্রফেসর মাধবী জীবনের প্রায় সতেরো বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধার সার্থক প্রয়োগ করেছেন, এরকম একটি অত্যাধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের নিদর্শনের জন্য। এই ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয় ২০০৫ সালে। কাজ শুরু হয় ২০১৭ সালে এবং ২০২২-এ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

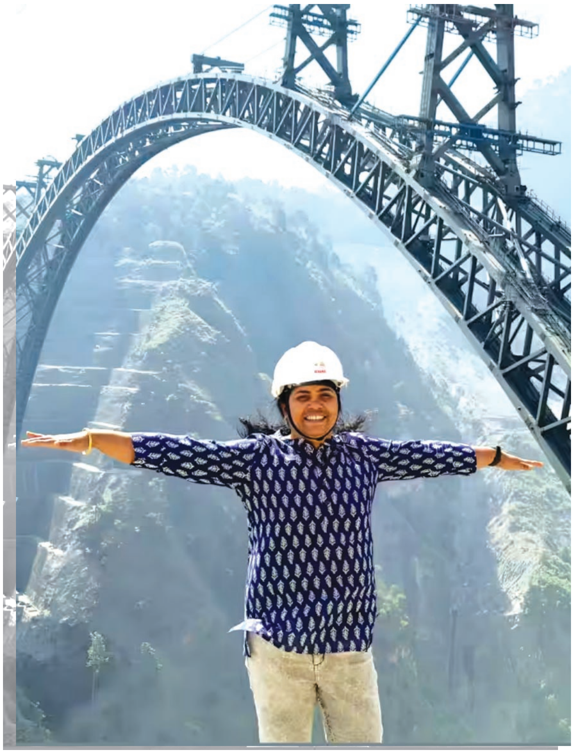

এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হয়েছে অসংখ্য পরীক্ষানিরীক্ষা। গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে দল এই পরিকাঠামোটি নির্মাণ করেছে, তার নেতৃত্ব দিয়েছেন মাধবী লাথা। প্রথমে দুটি পাহাড়ের পাথর পরীক্ষা করা হয়। তারপর পাথরের স্থিতিশীলতা, পাথরের মাঝে কতটা ফাঁক, কতটা ওজন বহন করতে সক্ষম, সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেন ইঞ্জিনিয়াররা। বেশ কিছু ঝুঁকি লক্ষ্য করে সেতু নির্মাণের জন্য এই বিশেষ দলটি নিয়োজিত হয়।

সেতুর ভিত যাতে শক্তিশালী হয়, সেজন্য পাথরের টুকরো এবং স্টিলের রড দিয়ে সিমেন্ট গ্রাউটিং করা হয়। প্রথম থেকেই মাধবী গুরুত্ব দিয়েছিলেন হাওয়ার প্রবল বেগ সহ্য করতে সক্ষম এমন বড়ো ও গভীর ভিত নির্মাণের দিকে। বিশ্বের সর্বোচ্চ এই সেতুটি ২২০ কিলোমিটার বেগে বওয়া বাতাসের গতি সহ্য করার ক্ষমতা রাখে।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভূমিকম্প। মাধবীর মতে, সবরকম ঝুঁকির কথা মনে রেখে তাঁরা নক্‌শায় বিভিন্ন পরিবর্তন করেন। যেখানে হওয়ার কথা ছিল, সেখান থেকে সামান্য সরানো হয়েছে। অর্থাৎ সেতু নির্মাণের পরিকল্পনাও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন করা হয়েছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙের ভাষায় একে 'ডিজাইন অ্যাজ ইউ গো অ্যাপ্রোচ' বলা হয়ে থাকে।

উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুলা রেল লিঙ্কের এই সেতুটি ১,৩৯৫ মিটার লম্বা। সর্বপ্রকার আপদ সহ্য করতে পারবে, এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে ইস্পাতের তৈরি আর্চ কাঠামোটিকে। ৭৮৫ মিটার লম্বা এই আর্চটি। কোঙ্কন রেলওয়ে কর্পোরেশান লিমিটেড এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ের যোথ উদ্যোগে নির্মিত হয়েছ এই সেতুটি। ২০২১ সালেই কোঙ্কন রেলওয়ে কর্পোরেশানের প্রাক্তন ডাইরেক্টর শ্রীরাজেন্দ্রকুমার কালবান্দের নেতৃত্বে এই আর্চটি নির্মামের কার্য সমাপ্ত হয়।

মাধবী হায়দরাবাদের জেএনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর এনআইটি ওয়ারাঙ্গল থেকে এমটেক করেন এবং আইআইটি চেন্নাই থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙে পিএইচডি করেন।

আইআইএসসি-তে যুক্ত হবার আগে একবছর আইআইটি গুয়াহাটিতে সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত আইআইএমসি-তে ছিলেন পোস্ট ডক্টরাল গবেষকরূপে। ২০০১ সালে মাধবী ইন্ডিয়ান জিওটেকনিকাল স্যোসাইটি কর্তৃক সেরা মহিলা ভূপ্রযুক্তিগত গবেষকরূপে স্বীকৃতি পান। ২০২২ সালে এসটিইএম- এর শীর্ষ ৭৫ জন মহিলার তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশের ইয়েগুপাড়ুর মূল নিবাসী মাধবী তাঁর গ্রামের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। অপার শক্তির ভাণ্ডার এই মাতৃশক্তির উদ্যোগ ও শ্রমকে আমরা সম্মান জানাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৬ জুন ২০২৫-এ জম্মু-কাশ্মীরে এই সেতুটির উদ্বোধন করেন। মাধবী লাথার কর্ম রয়েছে ইস্পাত ও পাথরে খোদাই করা, যা দৃঢ়তা, মৌলিক চিন্তা এবং জাতি গঠনের প্রতীক। আমাদের দেশের এমন অনেক শক্তিময়ী কন্যা আছেন, যাঁরা যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার দ্বারা বিকশিত ভারত গঠনে তাঁদের অমূল্য যোগদান করে চলেছেন। ◻

অনিদ্রা ও তার প্রতিকারের উপায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

দিনের তিনভাগের একভাগ ঘুমের জন্য বরাদ্দ। সেটা ঠিক করে দিয়েছে প্রকৃতি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চাপে মানুষের একটা বড়ো অংশ এখন ভুলতে বসেছে সে কথা। অসংখ্য মানুষ আবার ঘুমোতে চেয়েও ঘুমোতে পারেন না দুশ্চিন্তার জন্য। ফলে শরীরে বাসা বাঁধে ঘুমের অসুখ বা সোমনিপ্যাথি। আর তা থেকেই গুচ্ছ শরীর খারাপের সূত্রপাত।

যদি কম ঘুমানো কিংবা ঘুম না আসার সমস্যা নিয়মিত হয় তবে প্রথমে একে অসুখ নয়, অসুখের উপসর্গ বলে মনে করা হয়। যখন এর পিছনে শারীরিক বা মানসিক কোনো রোগের উৎস মেলে না, তখন এই ঘুম না আসাটাকেই অসুখ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

রোজ কত ঘণ্টা ঘুম জরুরি :

শিশুদের ১২ ঘণ্টা, বয়ঃসন্ধিতে ১০ ঘণ্টা এবং প্রাপ্ত বয়সে কমপক্ষে ৭ ঘণ্টা দৈনিক ঘুম জরুরি। সেই ঘুম রাত ১০টা থেকে সকাল ৫টার মধ্যে হলে খুব ভালো। দিনের ঘুম কখনো রাতের ঘুমের বিকল্প হতে পারে না। আমাদের শরীরের জৈবিক ঘড়ি সেভাবেই তৈরি।

নাক ডাকা কি ভালো ঘুমের সূচক?

না, একেবারেই নয়। বরং ঠিক উলটোটা। প্রবল নাক ডাকা মানে অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। এতে তালুর মাংসপেশি ঝুলে গিয়ে শ্বাসনালীতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন প্রবেশে বাধা দেয়, ফলে শরীর কম অক্সিজেন পায়। ও এস এ থাকলে দিনের বেলায় ঘুম পায় বেশি, লাগে ক্লান্তিও।

ঘুমের সমস্যা দূর করার জন্য কী কী করণীয়?

১. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে শুতে যান। উঠুনও নির্দিষ্ট সময়ে।

২. রোজ সকালে কিছুক্ষণের জন্য হালকা ব্যায়াম করুন।

৩. দিনের অনেকটা সময়, বিশেষত বিকালের দিকে কিছুক্ষণ আউটডোরে কাটান।

৪. শয়নকক্ষ যথাসম্ভব অন্ধকার থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. শুতে যাওয়ার আগে স্নান, অ্যারোমাথেরাপি বই পড়া, গানশোনা ইত্যাদির মতো অভ্যাস তৈরি করুন।

৬. মন ভালো থাকে এমন বিষয় কল্পনা করুন শুতে গিয়ে।

৭. খুব ঠাণ্ডায় হাতের তালু ও পায়ের চেটো গরম রাখুন ঘুমের সময়ে।

৮. বিছানায় বসে দিনের সবচেয়ে ভালো মুহূর্তেগুলো স্মরণ করুন।

৯. ঘুম হচ্ছে না কেন কিংবা কম ঘুম হচ্ছে জাতীয় চিন্তাকে বিদায় দিন।

ভালো ঘুমের জন্য কী কী ছাড়তে হবে?

১. বিছানা দিনভর অন্য কাজে ব্যবহার করবেন না।

২. রাতের বিছানায় শুতে গিয়ে সমস্যা, সমাধান ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা বন্ধ করুন।

৩. খুব কায়িক পরিশ্রম হয়, এমন কাজ এড়িয়ে চলুন ঘুমের ২/৪ ঘণ্টা আগে থেকেই।

৪. প্রিয়জনদের সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন না ঘুমের আগে।

৫. মনে উত্তেজনার সঞ্চার হয় এমন গেম, টিভি শো, ভিডিয়ো ক্লিপ ঘুমের আগে দেখবেন না।

৬. ঘুমের আগে চা, কফি, সোডা, চকলেট খাবেন না।

৭. মদ্যপান নৈব নৈব চ।

৮. খালি পেটে বা খুব ভরা পেটে শুতে যাবেন না।

৯. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া স্লিপিং পিল চলবে না।

১০. ঘুমোতে যাবার আগে বেশি ঝিমোবেন না।

১১. ঘুম না এলে বার বার ঘড়ি দেখবেন না।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা কি খারাপ?

একেবারেই নয়। স্বপ্ন সকলেই কম-বেশি দেখে থাকেন। আসলে ঘুমের চারটি চক্র— একভাগ, র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট যখন চোখের মণি নড়াচড়া করে এবং তিনভাগ নন-র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট যখন চোখের মণি স্থির থাকে। পাতলা ঘুম আরইএম থেকে যখন এনআরইএম চক্রে ঢোকে, তখনই ঘুম গাঢ় হয়। আমরা স্বপ্ন দেখি অগভীর ঘুমে। স্বপ্ন বেশি দেখার অর্থ, আরইএম চক্র লম্বা হচ্ছে। ফলে ঘুম গভীর হচ্ছে না, তার মানে ভালো ঘুম বিঘ্নিত হচ্ছে। এমন চলতে থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

ঘুমের ঘাটতি বোঝার উপায় কী?

দিনের উপসর্গ : সকালেই মাথা ধরা। কাজের ফাঁকে প্রবল ঘুম পাওয়া। মনোযোগ ঘাটতি। অকারণ বিরক্তি। খিটখিটে হয়ে পড়া। কাজের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়া। মাথা ঘোরা। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ঘুম না আসা।

রাতের উপসর্গ :

প্রবল নাক ডাকা, দম আটকে যাওয়া, শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষণিকের জন্য বন্ধ থাকা, ঘুমের মধ্যে ছটফট করা, বার বার বাথরুম যাওয়া। ঘুম না এলে বার বার ঘড়ি দেখা বা ঘড়ির শব্দ শোনা, রাতে বিছানা ছেড়ে পায়চারি করা।

এক্ষেত্রে কারণ জেনে মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ।

রাজস্থানের জয়পুরে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের অখিল ভারতীয় অধিবেশন

গত ৫ থেকে ৭ অক্টোবর রাজস্থানের জয়পুরে জামদোলি কেশব বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হলো অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের নবম ত্রিবার্ষিক অখিল ভারতীয় অধিবেশন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী-সহ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রায় তিন হাজারের অধিক সদস্য তিন দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবিআরএসএম, পশ্চিমবঙ্গ-এর 'বিদ্যালয় শিক্ষা'র সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক ও অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য বাপী প্রামাণিক, পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায় এবং 'উচ্চশিক্ষা'র রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সঞ্জীব নাগ-সহ বিদ্যালয় শিক্ষার ৭১ জন এবং উচ্চশিক্ষার ২০ জন মিলিয়ে মোট ৯১ জন জেলা, বিভাগ ও রাজ্য স্তরের কার্যকর্তা।

বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে এই সম্মেলনের বিভিন্ন সত্রে উপস্থিত ছিলেন— মহামণ্ডলেশ্বর জুনা পীঠাধীশ্বর আচার্য্য অবধেশানন্দ গিরি জী মহারাজ, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভজনলাল শর্মা, রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রী ড. প্রেমচাঁদ বৈরওয়া, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুরেশ সোনিজী, রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলওয়ার, রাজস্থান বিধানসভার অধ্যক্ষ সম্পত সিংহ, রাজ্যসভার সাংসদ ড. সুধাংশু ত্রিবেদী, এনসিইআরটি-র সভাপতি অধ্যাপক ডিপি সাকলানি, অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী মহেন্দ্র কাপুর, অখিল ভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক নারায়ণলাল গুপ্তা এবং অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গীতা ভট্ট।

তিন ধরে চলা এই অধিবেশনে বিভিন্ন স্তরের বহু শিক্ষাবিদ, গুণী ব্যক্তি-সহ বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রম, কার্যপদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা সংগঠনের কার্যকর্তাদের সামনে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভজনলাল শর্মা বলেন যে, এবিআরএসএম ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে 'জাতির স্বার্থে শিক্ষা, শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষক, শিক্ষকদের স্বার্থে সমাজ'— এই তিন দফা স্লোগান বাস্তবায়িত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, এই সংগঠন ভারতীয় সমাজে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের চেতনা জাগ্রত করেছে। ভারতীয় দর্শন এবং জাতীয়তাবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকরা প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত জাতি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন যা দেখে তিনি আপ্লুত ও অভিভূত।

রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রী ড. প্রেমচাঁদ বৈরওয়া বলেন, এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা জাতি গঠন এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা বোধ জাগরণের কাজে নিবেদিতপ্রাণ।

রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলওয়ার বলেন, এবিআরএসএম-এর নেতৃত্বে রাজস্থান শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন উচ্চতার দিকে এগিয়ে চলেছে।

এনসিইআরটি-র সভাপতি অধ্যাপক ডিপি সাকলানি 'জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০২০' সম্পর্কে বলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে নতুন শিক্ষানীতি। এটি মূল্যবোধভিত্তিক, দক্ষতাভিত্তিক এবং শিক্ষার্থীদের কাছে উপভোগ্য ও প্রাসঙ্গিক। এটি বৈভবশালী ভারতবর্ষ নির্মাণে সহায়ক।

রাজ্যসভার সাংসদ ড. সুধাংশু ত্রিবেদী তাঁর বক্তব্যে ভারতের সর্ববৃহৎ শিক্ষক সংগঠনের সকল কার্যকর্তার কাছে আবেদন করেন যে, ম্যাকলে ও মার্ক্সের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে ভারতীয় শিক্ষা ও জীবনধারা গ্রহণ করার সময় এসে গিয়েছে। তিনি আশাবাদী যে, এবিআরএসএম-এর হাত ধরেই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে বিদেশি প্রভাব মুক্ত হবে।

সম্মেলনের একটি পর্যায়ে সংগঠনের সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে উপস্থিত সাধারণ সম্পাদকরা নিজ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি সকলের সামনে তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধানে বিভিন্ন প্রস্তাবের উল্লেখ করেন। মহাসঙ্ঘের পক্ষ থেকে লিখিত

আকারে এই দাবিগুলি প্রস্তাব আকারে জাতীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং এনসিইআরটি-র উপযুক্ত আধিকারিকদের কাছে পেশ করা হবে বলে জানানো হয়।

প্রত্যেকবারের সম্মেলনের মতো এবারও সারা ভারত থেকে বাছাই করা তিনজন শিক্ষককে 'শিক্ষাভূষণ' পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। মহামণ্ডলেশ্বর জুনা পীঠাধীশ্বর আচার্য অবধেশানন্দ গিরি জী মহারাজ তিনজন বিদগ্ধ শিক্ষক মহাশয়ের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। এ বছরের পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন— রাজস্থানের উদয়পুরের অধ্যাপক ভগবতী প্রকাশ শর্মা, গ্রেটার নয়ডার গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং হরিয়ানার অধ্যাপক সুষমা যাদব, হরিয়ানার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাক্তন উপাচার্য এবং কেরালার অমৃত সংস্কৃত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভিজে শ্রীকুমার। 'শিক্ষাভূষণ' পুরস্কারে সম্মানিতদের নগদ ১ লক্ষ টাকা, একটি শংসাপত্র এবং একটি রুপার থালা তুলে দেওয়া হয়। এই সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে আচার্য অবধেশানন্দ গিরি বলেন যে, 'শিক্ষক' হলেন সেই গুরু যিনি মনের অজ্ঞানতাকে ধ্বংস করেন, শিক্ষার্থীকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান। শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে পরিপূর্ণতার জন্য প্রচেষ্টা করার ক্ষমতা দেয় এবং জীবনে পরিপূর্ণতার অনুভূতি সঞ্চার করে। তিনি আরও বলেন যে, শিক্ষকরা আমাদের সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সম্মেলনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা এবং সংগঠনের ভাবধারা উপলব্ধি করে তিনি এই সংগঠনের অনেক প্রশংসা করেন।

সম্মেলনের বিভিন্ন সত্রে দায়িত্ব অনুযায়ী কার্যকর্তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে মতামত বিনিময় ও বৈঠক সম্পন্ন হয়, যা সারা ভারত ব্যাপী বিভিন্ন প্রদেশের কার্যকর্তাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন স্থাপন করে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুরেশ সোনিজী তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে চরিত্র গঠনের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যে বিচারধারাকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রনির্মাণ কাজে এগিয়ে চলেছে তাতে এবিআরএসএম-এর ভূমিকা রাষ্ট্র গঠনে অনস্বীকার্য। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি নারায়ণলাল গুপ্তা বলেন, মহাসঙ্ঘ শিক্ষাক্ষেত্র এবং সমাজে জাতীয়তাবোধ প্রচার-প্রসারের কাজ করে চলেছে। শিক্ষকদের তিনি সমাজ গঠনের ভিত্তি এবং জাতীয় অগ্রগতির পথপ্রদর্শক বলে অভিহিত করেন।

অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী মহেন্দ্র কাপুর, সাধারণ সম্পাদক গীতা ভট্ট, রাজস্থানের রাজ্য সভাপতি রমেশ চন্দ্র পুষ্কর্ণ, রাজস্থান বিধানসভার অধ্যক্ষ সম্পত সিংহ-সহ অন্যান্য অনেক গুণী ব্যক্তি এই সম্মেলনের বিভিন্ন সত্রে উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে, সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গীতা ভট্ট অধিবেশনে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

'ভ্রাতৃত্ব মঙ্গল'— জনজাতি শিশুদের মুখে ফুটল দীপাবলীর হাসি

গত ২১ অক্টোবর মেদিনীপুর শহরের সেলিব্রেশন হলে শুভ দীপাবলী উপলক্ষ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের জনজাতি শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে 'আত্মদীপ' পরিবারের উদ্যোগে 'ভ্রাতৃত্ব মঙ্গল'-নামক বস্ত্র প্রদান কর্মসূচি এবং

ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান হয়। সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে ভালোবাসা, আনন্দ ও উৎসবের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী প্রসূন মৈত্র। প্রধান উদ্যোক্তা বিশিষ্ট সমাজসেবী কুহেলী দত্ত বলেন, 'আমাদের ছোট্ট এই প্রয়াসে যদি এই শিশুদের মুখে একটু হাসি আসে, তাহলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।' অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক শিশু অংশ নেয়। তাদের হাতে নতুন পোশাক, মিষ্টি ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ভাইফোঁটার মাধ্যমে ভাই- বোনের সম্পর্ক ও সামাজিক ঐক্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এদিনের অনুষ্ঠানটি। 'আত্মদীপ' পরিবারের সদস্যরা জানান, ভবিষ্যতেও সমাজের বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে তাঁরা এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন।

গত ১৮ অক্টোবর আরোগ্য ভারতী ব্যারাকপুর জেলার উদ্যোগে খড়দহে ২৬ মন্দির ও ঘাট প্রাঙ্গণে ধন্বন্তরী জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়।

প্রতি বছরের মতো এবছরও দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি-স্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় মাধব ভবনে ওই এলাকায় কর্মরত সমাজবন্ধু, স্বচ্ছতা কর্মীদের নিয়ে সহভোজ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি উত্তববঙ্গ সেবা ভারতীর পক্ষ থেকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র। এদিনের অনুষ্ঠানে সামাজিক সমরসতা মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ হিতেন চক্রবর্তী বলেন যে, সঙ্ঘ সামাজিক

শিলিগুড়িতে স্বচ্ছতা কর্মীদের নিয়ে সহভোজ এবং উপহার প্রদান

সমরসতার কথা কেবল মৌখিকভাবেই প্রচার করে না, বরং প্রতিটি আচরণে তা পালনও করে। এদিন বাল্মীকি সমাজের ৩৭ জন পুরুষ এবং ১৩ জন মাতৃশক্তি মোট ৫০ জন স্বচ্ছতা কর্মীর হাতে পূজা উপলক্ষ্যে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায় এবং অন্যান্য প্রচারক ও কার্যকর্তারা।

ফেডারেশন হল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ অক্টোবর মধ্য কলকাতা-স্থিত 'মিলন মন্দির' বা ফেডারেশন হলে উদ্‌যাপিত হয় 'ফেডারেশন হল সোসাইটি'র ১২১তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন 'শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কলকাতার সঙ্গে যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ফেডারেশন হল কর্তৃপক্ষ। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফেডারেশন হল'। এই হলের প্রতিষ্ঠালগ্নে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, 'স্বদেশি হলো সেই পদ্ধতি, সেই পথ, যে পথের মাধ্যমে দেশ ও জাতি এগিয়ে চলে।' ফেডারেশন হলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ফেডারেশন হল সোসাইটি ও 'কলকাতা কথকতা'র যৌথ উদ্যোগে গত ১৬-১৮ অক্টোবর ফেডারেশন হল প্রাঙ্গণে একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে 'প্রধান অতিথি' ছিলেন 'দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা'র সেক্রেটারি স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। মহারাষ্ট্রের পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল এবং কলকাতা ও বোম্বে হাইকোর্টের পূর্বতন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ও পূজনীয় মহারাজ এই প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ এবং প্রসার ভারতীর পূর্বতন মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জহর সরকার ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানের 'সম্মানিত অতিথি'। আনন্দবাজার পত্রিকার বর্ষীয়ান সাংবাদিক শিশির রায়, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র কলকাতার রিজিয়োনাল ম্যানেজার সঞ্জিত বড়ুয়া এবং 'শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কলকাতা'র ট্রাস্টি বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 'বিশেষ অতিথি' হিসেবে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল, এলাহাবাদ হাইকোর্টের পূর্বতন প্রধান বিচারপতি এবং ফেডারেশন হল সোসাইটির সভাপতি শ্যামল কুমার সেন।

এদিন উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুসৌমী মাইতি ভৌমিক। স্বাগত ভাষণ দান করেন ফেডারেশন হল সোসাইটির সহ-সভাপতি শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানের বিষয়টি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন ফেডারেশন হল সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক শ্যামল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেডারেশন হল সোসাইটির ইতিহাস আলোচনা করেন সোসাইটির লাইব্রেরি কমিটির চেয়ারম্যান ড. এসকে শেঠ। এরপর তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। এরপর পূজনীয় মহারাজ ও চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি জহর সরকার। এরপর বিশেষ অতিথিরা তাঁদের বক্তব্য রাখেন। তারপর সভাপতির ভাষণ দান করেন শ্যামল কুমার সেন।

সবশেষে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ফেডারেশন হল সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক তাপস কান্তি চৌধুরী। কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রাহকদের পক্ষ থেকে সংগৃহীত নানা অমূল্য সংগ্রহ এই প্রদর্শনীটিতে প্রদর্শিত হয়। স্বদেশি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিরল উপকরণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অটোগ্রাফ (স্বাক্ষর), নানা ঐতিহাসিক নথি, অনেক উল্লেখযোগ্য মামলার নথিপত্র, পুরনো লিফলেট, ইংরেজ রাজত্বে স্বদেশি শিল্পায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশীয় এন্টারপ্রাইজ বা ছোটো-বড়ো বাণিজ্যিক উদ্যোগের নানা নিদর্শন এবং ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতের স্বনির্ভরতার প্রতীক 'চরকা' ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামগ্রীর দেখা মেলে এই প্রদর্শনীতে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিবিজড়িত দুষ্প্রাপ্য চিঠি, বইপত্র ও ছবির এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস। তাঁর পিতামহ ডাঃ ললিত মোহন বিশ্বাসকে লেখা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, হেমন্ত কুমার বসু, একে ফজলুল হক, নেলি সেনগুপ্ত-সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের বরেণ্য নেতৃস্থানীয়দের চিঠিপত্র তিনি এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরেন। প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

হালিশহরে ভূত চতুর্দশী তিথি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

বাঙ্গালি সংস্কৃতির ভুলে যাওয়া অধ্যায়গুলিকে প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী করে তুলছে 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির' নামক একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। শাস্ত্রীয় মর্যাদায় হিন্দু পালাপার্বণগুলিকে সমবেতভাবে উদ্‌যাপন করে সমাজে প্রতিনিয়ত এক সংহতির বার্তা দেওয়া ছাড়াও আচার-অনুষ্ঠানগুলির পিছনে থাকা বিজ্ঞানভাবনাগুলিকেও তারা তুলে আনছে যত্ন সহকারে। গত ১৯ অক্টোবর ছিল ভূত চতুর্দশী তিথিকে কেন্দ্র করেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিশহরের গঙ্গাতীরে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত হলো একটি মনোজ্ঞ

অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল— দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির, দেশের মাটি মাতৃ মিলন মন্দির এবং স্বামী বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশন (মোক্ষ গুরুকুল)। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল— চৌদ্দ শাকের ভেষজগুণের ওপর আলোচনা এবং চৌদ্দ প্রদীপ প্রজ্বলনের সান্ধ্যকৃত্য। অনুষ্ঠানের অন্যতম সহ-আয়োজক 'স্বামী বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশন'-এর কার্যকর্তা শামিত লাহিড়ী এদিনের অনুষ্ঠানটিকে বর্ণনা করেছেন— 'হিন্দু জীবনচর্যার প্রবাহে বিঘ্ন দূরীকরণ এবং সনাতনী হিন্দু পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে শাস্ত্রীয় আলোকমালা প্রজ্বলন।' এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চ আলোকিত করেন মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গৌতম বর্মণ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সেবা প্রমুখ মদন বিশ্বাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা 'দেশের মাটি মাতৃ মিলন মন্দির'-এর বিশিষ্ট প্রতিনিধি সুমনা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সম্পাদক মিলন খামারিয়া। প্রদীপ প্রজ্বলনের সাংগীতিক নেতৃত্ব দেন সংস্কার ভারতীর প্রতিনিধি দোলন চক্রবর্তী। তিনটি সংগঠনের মিলিত অনুষ্ঠান ছিল এদিনের আলোচনা সভা ও আলোকমালা।

এদিন মধ্যাহ্নে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে সমবেতভাবে প্রসাদ গ্রহণ করে সদস্যরা শুরু করেন অনুষ্ঠান। আয়োজকদের পক্ষ থেকে উপস্থিত দর্শক- শ্রোতামণ্ডলীকে চৌদ্দশাকান্নের প্যাকেটও পরিবেশন করা হয়। শাকান্ন গ্রহণ করেই সম্পন্ন হয় আলোচনাসভা, তথা চৌদ্দশাকের গুণাগুণ বার্তার কার্যক্রম। এদিন রান্না করে সমবেত সকলকে চৌদ্দশাকান্ন-সহ মোড়ক তুলে দেন রূপা চক্রবর্তী ও শামিত লাহিড়ী। এরপর চৌদ্দ শাক গ্রহণ, ভূত চতুর্দশী উদ্‌যাপন ও চৌদ্দবাতি প্রজ্বলনের বিষয়ে আলোকপাত করেন অধ্যাপক ড. গৌতম বর্মণ এবং বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ও দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের প্রধান পরামর্শদাতা ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে একসঙ্গে শাকান্ন গ্রহণ করেন; একসঙ্গেই চৌদ্দবাতি নিবেদন করেন তাঁরা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে। এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ছন্দা হালদার। আবৃত্তি করেন পিয়াসা বিশ্বাস, পুতুল দে ও তুহিন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে তুহিন চক্রবর্তীর কণ্ঠে শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে।

বিপ্লবী লীলা রায় ও অনিল রায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১৮ অক্টোবর 'জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্ট'-এর উদ্যোগে ও 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক'-এর সহযোগিতায়, ওই কেন্দ্রের শিবানন্দ হলে বিপ্লবী, দেশনেত্রী লীলা রায় ও বিপ্লবী, দার্শনিক অনিলচন্দ্র রায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভা ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার'-এর সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এদিনের অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। এদিনের আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দজী মহারাজ। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক ও বিশিষ্ট বিবেকানন্দ গবেষক তরুণ গোস্বামী এবং জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদক বিজয় কুমার নাগ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ঋতম দত্তর কণ্ঠে পবিত্র বেদ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন রজত চক্রবর্তী। এরপর হয় সভার সম্মানিত ও বিশিষ্ট অতিথিদের বরণ পর্ব। এরপর স্বাগত ভাষণ দান করেন বিজয় কুমার নাগ। বিপ্লবী, দেশনেত্রী লীলা রায় এবং বিপ্লবী, দার্শনিক অনিল রায়ের জীবন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদানের ইতিহাসটি তিনি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। এরপর সম্মানিত অতিথিরা বিপ্লবী লীলা রায় ও অনিল রায়ের জীবনী সংবলিত একটি 'স্মরণিকা গ্রন্থ'-এর আবরণ উন্মোচন করেন। বিপ্লবী লীলা রায় এবং তাঁর সম্পাদিত জয়শ্রী পত্রিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন তরুণ গোস্বামী। তিনি বলেন, ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন লীলাবতী নাগ এবং ১৯০১ সালের ২৬ মে ঢাকার মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন অনিলচন্দ্র রায়। স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশনেত্রীর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, তাঁর অবয়বে, তাঁর ক্রিয়াকলাপে যে তাঁদেরই ছায়া দেখতে পাওয়া যায়— ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে একাধিক উদাহরণ সহকারে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তরুণবাবু এই বিষয়টি উপস্থাপন করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা স্বামী বলভদ্রানন্দজী মহারাজ। তিনি বলেন, ১৯২৩ সালে এশিয়ার প্রথম মহিলা সংগঠন 'দীপালী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষা আন্দোলন, বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৩১ সালে 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশনেত্রী লাভ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আশীর্বাদ ও সমর্থন। বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী ছিলেন দেশনেত্রীর ভাবশিষ্যা। বিপ্লবী সংগঠন 'শ্রীসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন বিপ্লবী অনিল রায়। ১৯৩৮ সালে 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি'র সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশনেত্রী। ১৯৩৯ সালে বিপ্লবী লীলা নাগ ও অনিল রায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিপ্লবী কর্মধারায় যুক্ত থাকার দরুন তাঁদের বার বার কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯৪১ সাল থেকে ফরওয়ার্ড পত্রিকা সম্পাদনা, ১৯৪৬ সালে সংবিধান সভায় নির্বাচিত হওয়া, নোয়াখালি গণহত্যার পর তাঁর নেতৃত্বে ত্রাণ ও সেবাকাজ, স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাঁর লড়াইয়ের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন দেশনেত্রী লীলা রায়।

বিপ্লবী অনিল রায় ও লীলা রায়ের কর্মময় জীবন যেন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উপস্থাপিত এবং স্বামীজী বর্ণিত কর্মযোগেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরপর বিপ্লবী অনিল রায় রচিত ও সুরারোপিত দু'টি সংগীত পরিবেশন করেন শ্রী রজত চক্রবর্তী ও ঋতম দত্ত। এরপর সভাপতির অভিভাষণ দান করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর রচনা থেকে উদ্ধৃতিদান করে তিনি বলেন যে, লীলা রায় যেন ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক দায়িত্বের প্রস্তরিত প্রতিমা। সংগীতে দক্ষ, দর্শনে দীপ্ত, দেশসেবায় নিবেদিতপ্রাণ অনিল রায় ছিলেন চিৎ বৃত্তিতে সংগঠক বিপ্লবী, হৃৎ বৃত্তিতে মানবপ্রেমিক। মহারাজের বক্তব্যের পর গবেষক ও অধ্যাপক ড. পলাশ মণ্ডল দেশনেত্রীর উপর তাঁর গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আজকের দিনে বিপ্লবীদ্বয়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি তিনি জোরালোভাবে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যের পর বাংলাদেশের গবেষক এলিজা বিন্তে ইলাহি নির্মিত 'লীলাবতী'- শীর্ষক তথ্যচিত্রটি সভাগৃহে প্রদর্শিত হয়। তথ্যচিত্রটিতে বিপ্লবী, দেশনেত্রীর সম্পূর্ণ জীবনকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন এলিজা। তথ্যচিত্রটির প্রদর্শনীর পর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন জয়শ্রী পত্রিকার অন্যতম ট্রাস্টি ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শঙ্কর কুমার চট্টোপাধ্যায়। এরপর জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে। জাতীয়তাবোধে দীপ্ত মানুষদের সমাগমে এদিন সভাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'বিপ্লবী লীলা রায়-অনিল রায় ১২৫তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন কমিটি'র আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক অম্লান কুসুম ঘোষ।

ফঃ ৪

জলপাইগুড়ি জেলার সামাজিক সমরসতা মঞ্চের উদ্যোগে গত ১৯ অক্টোবর জলপাইগুড়ি শহরের ১৯জন সাফাইকর্মীকে দীপাবলী ও ছটপূজার শুভকামনা জানিয়ে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানে তাদের হাতে নতুন বস্ত্র, মিষ্টির প্যাকেট ও জলের বোতল তুলে হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সামাজিক সমরসতা প্রমুখ দিলীপ ভকত, জলপাইগুড়ি জেলা সামাজিক সমরসতা প্রমুখ নারুগোপাল দে, কোনপাকড়ি গৌড়ীয় মঠের আচার্য মহারাজ, বিশিষ্ট শিল্পপতি প্রশান্ত সরকার। এছাড়াও শহরের বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মালদা জেলা পরিবেশ সংরক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে এবং অরবিন্দ পার্ক যোগ কেন্দ্র ও ঝলঝলিয়া রেলকলোনি যোগ কেন্দ্রের সহযোগিতায় গত ২৫ অক্টোবর এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পর্যাবরণ গতিবিধির প্রমুখ জয়ন্ত চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের উদ্যোগে ‘আজাদ হিন্দ দিবস’ উদ্‌যাপন

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেই দিন ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন নেতাজী। গত ২১ অক্টোবর, কলকাতা- স্থিত আইএনএ মেমোরিয়ালে এই দিনটি উদ্‌যাপন করল রাষ্ট্রবাদী সংগঠন— ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’। আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিসৌধে অভিবাদন (স্যালুট) জানিয়ে ‘জয় হিন্দ’, ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি-সহ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত, ভারত জননীর মহান সন্তানদের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। তাঁদের দ্বারা সংঘটিত রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তাঁদের আত্মত্যাগ, বলিদান-সহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অসামান্য অবদানের কথাও তাঁরা এদিন স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় আর্তত্রাণ সমতির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শান্তনু মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অনিমিত্র চক্রবর্তী, দোলন ঘোষ, স্বর্ণাভ মুখোপাধ্যায়, সৌম্যদীপ সরকার, সুমিত ভৌমিক প্রমুখ নেতাজী-অনুগামী। ‘জনগণমন অধিনায়ক’ গানের অনুবাদ INA-anthem সমবেত কণ্ঠে গাওয়ার মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

Today's Choice.....
Vandana®
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

মেদিনীপুর জেলার মাদপুর খণ্ডের স্বয়ংসেবক তথা কলকাতা মহানগর প্রচারক নরেন্দ্রনাথ বেরার মাতৃদেবীর বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গ্রামের দুঃস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ, পূর্বক্ষেত্র গ্রাম বিকাশ প্রমুখ অশোক পাড়ি, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের সহ সংযোজক রতন চক্রবর্তী এবং বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

রাজপুত আর্য-ক্ষত্রিয় সমাজের বিজয়া সম্মিলনী ও দশমবার্ষিকী উদ্‌যাপন

রাজপুত আর্য-ক্ষত্রিয় সমাজ, পশ্চিমবঙ্গে বিজয়া সম্মিলনী এবং দশম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ২৬ অক্টোবর হাওড়া জেলার বেলুড়ে রেহান ম্যারেজ হল অ্যান্ড লজে এক মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজপুর আর্য-ক্ষত্রিয় সমাজ শুধুমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের নয়, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মধ্যেও কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ করে থাকে। এদিনের অনুষ্ঠানে বন্দনা, প্রসিতা, সোনালী, শ্রীজা, দেবশ্রিতা, স্মৃতি সর্বাণী, সুস্মিতা, গরিমা, ইন্দ্রজিৎ, মমতা ও চণ্ডীচরণ নৃত্য-সংগীত-আবৃত্তিতে খুব সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। অনুষ্ঠানে দেবী দুর্গার শাস্ত্রীয় রূপ এবং কন্যারূপে বন্দনার ভাষ্যচিত্র উপস্থাপন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য তথা উইমেন রিসার্চ সেন্টারের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ মীনাক্ষী রায়। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রদ্যোত সিংহরায় দেশমাতৃকার সঙ্গে মা দুর্গার তাৎপর্য বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় আইএসসি পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের (৯৯.২৫ শতাংশ) জন্য গরিমা রায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'ক্ষত্রিয় বিদ্যারত্ন অ্যাওয়ার্ড' স্মারক ও মেডেল। এরপর সাংগঠনিক কাজে দক্ষতার জন্য ৩জন সদস্যকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রসিতা সিংহরায়। সংগঠনের কলকাতা জেলার সভাপতি মুকুল সিংহ বলেন, এই সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের রাজপুত-ক্ষত্রিয় সমাজের উন্নয়নের জন্য বিগত দশ বছর ধরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধমে নিলরস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা গত ২৬ অক্টোবর সিউড়ী বড়োবাগানের হ্যাপি হোম বৃদ্ধাশ্রমের ৮০ বছর বয়স্কা মুক্তারানি চট্টোপাধ্যায় এবং ৮৫ বছর বয়স্কা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি এবং শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেন শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুভব বর্ণনা করেন বৃদ্ধাশ্রমের কর্ণধার তথা ডাক ও তার বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার পুলক কুমার সিনহা। পূজা করেন অনুভবী মিনতি দাস ও বন্দনা দাস। মাল্যদান করেন কল্পনা বিষ্ণু। মানপত্র পাঠ করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায় ও আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। সংস্থার উদ্দেশ্য বিষয়ে বলেন অধ্যাপিকা চৈতালী মিশ্র। অর্ঘ্য হিসেবে তাঁদের হাতে উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীগীতা, ফল ও মিষ্টান্ন তুলে দেন সংস্থার সম্পাদক দামোদর ঘোষাল, অনুভবী পার্বতী দত্ত, জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, মীনা কর্মকার, শীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিকা চট্টোপাধ্যায় ও অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ও সুজাতা বিষ্ণু। অনুভব বর্ণনা করেন বৃদ্ধাশ্রমের সেবক দিলীপ কুমার দাস। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায় ও রূপালী ঘোষাল। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শচীদানন্দ দত্ত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পতিত পাবন বৈরাগ্য।

ডাকাত কালী এবং মা সারদা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

প্রত্যুষে দিগন্তরেখা থেকে উঠে আসা সূর্যের আলোয় রাঙা ওঠে চারিদিক। প্রদেশে একইভাবে দিগন্তে ডুব দিতে দিতে সকলকে রাঙিয়ে দিয়ে যায় অস্তগামী সূর্য। এ এক নিত্যদিনের ঘটনা। এ ঘটনা পরম সত্য। বিস্ময়করও। আবার এ ঘটনা এতই স্বাভাবিক যে বহু সময়ই মানুষ চোখ মেলে দেখে না পুব অথবা পশ্চিমাকাশের এই রংবদল। না দেখলেও পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের এই ওঠা বা অস্ত যাওয়ার সামগ্রিক মুহূর্তগুলিকে পরিমাপের জন্য সন-তারিখ-বছর ইত্যাদি অভিধায় বন্দি করে রেখেছে মানুষ। প্রকৃতির প্রতিদিনের এই রংবদল হঠাৎই বড়ো স্মরণীয়-বর্ণময়-গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হয়ে যায় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় উপাদান।

এমনই এক স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিন ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১৩ জ্যৈষ্ঠ। কেবল বঙ্গদেশ বা ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতের এ এক অনন্য ঘটনা। জ্যৈষ্ঠের ওই অমাবস্যার রাতেই ছিল ফলহারিণী কালিকা পূজা। আর সেই পূজার রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী রূপে পূজা করেছিলেন তাঁরই সহধর্মিণী সারদাদেবীকে। সারদাদেবীর বয়স তখন আঠেরো।

জ্যৈষ্ঠের সেই অমানিশায় সহধর্মিণী সারদামণিকে দেবীর আসনে বসান শ্রীরামকৃষ্ণ। তারপর তাঁর দেহে কালীর অবস্থানের জন্য আহ্বান জানান দশমহাবিদ্যার তৃতীয় বিদ্যা ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরীকে। জলদগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় আবাহন মন্ত্র : 'অয়ি বালে, হে সর্বশক্তির অধিকারী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীর-মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণসাধন কর!'

আবাহন শেষে যথাবিধি পূজা করে নিজের সমস্ত সাধনার ফল, জপের মালা প্রভৃতি শ্রীদেবীর পাদপদ্মে চিরকালের মতো বিসর্জন দিয়ে প্রণাম করতে করতে বলেন, 'হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি, ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরী, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। তোমাকে প্রণাম করি।'

সাঙ্গ হলো পূজা। মানবী সারদামণির দেহ অবলম্বনে ঈশ্বরীয় উপাসনার শেষে সমাপ্ত হলো শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনার— সম্পূর্ণতা পেল তাঁর দেব-মানবত্ব পরিপূর্ণভাবে। একই সঙ্গে মানবী সারদাদেবীও প্রতিষ্ঠিত হলেন অধ্যাত্মজগতে দেবীর পুণ্য আসনে। মানবী হলেন দেবী।

এ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। সবই ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। অথবা মানবীর দেবীরূপে আত্মপ্রকাশের ইঙ্গিত ছিল তাঁর আবির্ভাব লগ্ন থেকেই।

সারদা-জননী শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠ জড়িয়ে বালিকারূপে দেবী শ্যামা যেদিন বলেছিলেন, আমি তোমার মেয়ে হয়ে আসছি গো, সেদিনই তো বেজেছিল বোধনের পুণ্যগান। এরই পরে তো জন্ম সারদা দেবীর। বালিকা সারদা হন শ্রীরামকৃষ্ণ জায়া। কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে আরাধ্যা দেবী ভবতারিণীকে দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তাই বয়সে অনেকই ছোটো সারদাকে সমীহ করতেন তিনি। বলতেন, সারদা হলেন ভগবতী, কালী। শুধু বলতেন না, সাবধান করে দেন ভাগ্নে হৃদয়কেও। বলেন, সংযত ব্যবহার করবে ওর সঙ্গে। ও যদি রেগে যায় তাহলে সর্বনাশ হবে তোমার।

সারদা দেবী তখন রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে নহবত খানায়। নীরবে করে যান স্বামী সেবা কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই। হঠাৎই কোনো খেয়ালে সেদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন সারদা দেবী, 'আমাকে তোমার কী মনে হয়?'

দিব্যজ্ঞানের বারিধারায় স্নাত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বলেন, যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নবহতে বাস করছেন এবং তিনি এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্বদা সত্য দেখতে পাই।'

ভগবতী তনু মা সারদা। ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, লোকে বলে আমি ভগবতী, আমি ভগবতী, বলতে বলতে ভাবের সাগরে ডুব দেন মা।

তিনি দেবী। একথা নিজেও স্বীকার করেছেন নানা সময়ে। সেবার যেমন এক ভক্তের জিজ্ঞাসা, 'মা আপনি কি সাক্ষাৎ কালী'। চমকে ওঠেন মা, এটা ওটা বলে প্রসঙ্গ বদলাতে চান। ভক্ত কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলেই চলেছে 'বলুন না মা, সত্যি করে বলুন না।' কথার পরে কথা। তবুও ওই একই প্রশ্ন। অবশেষে রহস্যের মোড়কে দিলেন ধরা। বলেন, 'ওই লোকে বলে কালী'। বলেই দ্রুত পালটান সে প্রসঙ্গ।

তিনিই মা কালী। এমন অনুভব হয়েছে অনেকেরই। সেবার যেমন, কামারপুকুর থেকে যাচ্ছেন জয়রামবাটি। সঙ্গে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো শিবরাম। বয়সে নেহাতই বালক। জয়রামবাটিতে ঢোকার মুখে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ে শিবরাম। পেছন ফিরে মা বলেন, কী রে দাঁড়িয়ে কেন, চল!

—যেতে পারি, যদি একটা কথা বলো।

—কী কথা?

—তুমি সত্যি-সত্যি কে?

হেসে বলেন সারদা, কে আবার, তোর খুড়ি। শিবরাম বলে, তাহলে যাও, এই এসেই তো পড়েছো!

শিবুর ছেলেমানুষির কাছে শেষে হার মানেন মা। বলেন, 'লোকে বলে কালী'।

—কালী! মা কালী তো? ঠিক?

—হ্যাঁ ঠিক।

—তবে চলো।

শান্ত শিবরাম জয়রামবাটিতে মায়ের বাড়িতে আসে মা সারদাকে নিয়ে।

মা সারদাই মা কালী, এই কথা জানার পর শান্ত হয় শিবরাম। মিটে ছিল তার মনের খিদে। ধাতস্থ হয় শিবরাম জীবনে।

একই রকমভাবে ধাতস্থ হয়, তেলোভেলোর মাঠের সেই বাগদি ডাকাতও। মা সারদা চলেছেন স্বামী সন্দর্শনে দক্ষিণেশ্বরে। জয়রামবাটি থেকে সে অনেকখানি পথ। মাঝখানে পড়ে কুখ্যাত তেলোভেলোর মাঠ। ডাকাতদের অবাধ রাজ্য। তাই দিন থাকতে থাকতেই সকলে পার হয় জায়গাটা। সারদাদেবী কিন্তু পারেন না। সঙ্গীদের থেকে পিছিয়ে পড়েন ক্রমেই। একসময় বলেন, তোমরা এগিয়ে যাও, অপেক্ষা করো তারকেশ্বরে। আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি। আমায় সঙ্গ দিতে গেলে বিপদে পড়বে তোমরাও।

বাস্তবটা বুঝে সারদাকে রেখেই এগিয়ে যায় সঙ্গীরা। একলা সারদা চলেছেন। এমন সময় সন্ধ্যা নামে। অন্ধকার গাঢ় হয়। সারদা তখনও তেলোভেলোর মাঠেই।

এমন সময় অন্ধকারের মধ্য থেকে বাজখাই গলার আওয়াজ, কে যায়?

ঘুরে তাকান সারদা। কিন্তু তাঁকে দেখে আঁতকে ওঠে দুর্দান্ত বাগদি ডাকাত। ভয়ে বয়ে যায় একটা শীতল প্রবাহ তার শরীরে। একে! এ কী দেখছে সে!

দু' হাতে চোখ রগড়ায়। দেখে, দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মা কালী। থরথর করে কাঁপছে সেই ভয়ংকর ডাকাত। ওদিকে সারদা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি বাবা, তোমার মেয়ে। চলেছি দক্ষিণেশ্বরে তোমাদের জামাইয়ের কাছে।

ততক্ষণে সেখানে হাজির বাগদি ডাকাতের বউও। তারও সেই একই অবস্থা। এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ কালী। খসে পড়ে ডাকাতের হাতের লাঠি। বজ্র কণ্ঠে তখন কোমল বাঁশির সুর, কে মা তুমি?

—আমি সারদা। তোমাদের মেয়ে। সঙ্গীরা সব আগে চলে গেছে। আমি একা। বোধহয় পথ হারিয়েছি।

বাগদি ডাকাতের কানে সারদামণির এসব কথা ঠিকমতো পৌঁছয় না। সে তখনও সাক্ষাৎ মা কালীর দর্শনের অপার আনন্দে বারে বারে শিহরিত।

ডাকাত-গৃহিণী ততক্ষণে এগিয়ে আসে। দেবী দর্শন নয়। সারদার কথার জাদুতে তখন বিমোহিত। সারদাকে প্রায় আগলে ধরে ডাকাত-গিন্নি বলে, তোমার কোনো ভয় নেই মা। আমরা থাকতে কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি চলো আমাদের সঙ্গে। আমরা পথ দেখাবো তোমাকে।

সারদাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের দিকে চলে বাগদি ডাকাত-দম্পতি। একটা মুদির দোকান থেকে মুড়ি-মুড়কি কিনে খেতে দেয় তারা সারদামণিকে। তারপর সারা রাত জেগে পাহারা দেয় সারদাদেবীকে। সারদাও তাদের আশ্রয়ে নির্ভয়ে গভীর ঘুমে ডুবে যান।

পরদিন সকালে ডাকাতদম্পতি পথ

দেখিয়ে সারদাদেবীকে পৌঁছে দেন তারকেশ্বরে। সেখানে তারকনাথের পূজা দেয়। গিন্নির কথায় বাজার করে আনে সেই বাগদি ডাকাত। হয় রান্নাবান্না। খাওয়া দাওয়া। তারই মধ্যে দেখা হয়ে যায় সারদামণির সঙ্গীদের সঙ্গে। তারকেশ্বর থেকে যাত্রা এবার দক্ষিণেশ্বরের পথে।

অপূর্ব সে বিদায় দৃশ্য। ডাকাত আর তার বউ দুজনের চোখেই জল। যেন মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হবে। বিদায়ের মুহূর্তে সারদার আঁচলে কিছু কড়াইশুটি বেঁধে দেয় ডাকাতবউ, পথে খাবার জন্য।

দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে ওইভাবেই দেবী সারদার কালীরূপ দর্শন করে ধন্য হয় বাগদি ডাকাত দম্পতি।

আবার একবার ওই পথেই স্বয়ং মা কালী বালিকাবেশে আসেন সারদামণির কাছে। সেবারও দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলেন সারদা তাঁর বাবার সঙ্গে। পথে ধুম জ্বর। বাধ্য হয়ে এক চটিতে আশ্রয় নেন বাবা আর মেয়ে। রাত গভীর। জ্বরে সারদাদেবী প্রায় অচৈতন্য। তারই মধ্যে দেখেন ঘরে যেন আলোর বান ডেকেছে। সেই আলোর সমুদ্র থেকে উঠে আসে এক কালো মেয়ে। আহা, কী তার রূপ। দেখে যেন আশ মেটে না।

চেতন-অচেতন একটা অবস্থার মধ্যে সারদা দেখেন, আলোর সাগর থেকে উঠে আসা সেই মেয়ে তাঁর পাশে বসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার সেই মমতাভরা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়ায় শীতল হয় সারদার দেহ-মন প্রাণ। পরম আগ্রহে জানতে চান তিনি, তুমি কে গা! কোথা থেকে আসছো?

হেসে বলে সেই কালো মেয়ে, আমি আসছি দক্ষিণেশ্বর থেকে।

দক্ষিণেশ্বর নাম শুনেই সারদা বলেন, আমিও তো সেখানেই যাচ্ছিলাম। তবে কপালে বোধহয় নেই তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া। তাঁর সেবা করা আর ভাগ্যে হবে না।

—কেন হবে না? ভালো হয়ে তুমি সেখানে যাবে। তার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।

—আটকে রেখেছো। আমার জন্য। তুমি আমার কে হন গো।

—আমি— আমি তোমার বোন।

—ও সেইজন্য এসেছো। বেশ-বেশ।

ঘুমে ডুবে যান সারদা। পরদিন সকালে সম্পূর্ণ সুস্থ। বাবার সঙ্গে আবার রওনা হলেন দক্ষিণেশ্বরে। পৌঁছলেন নিরাপদে। সেবার ভগবতী সারদা এভাবেই পেলেন মা কালীর কৃপা। তাঁরই স্পর্শে সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন।

শোনা কথা, আর একবার এই পথে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সময় ডাকাতের হাতে পড়েন মা সারদা। তারকেশ্বর অঞ্চলের দুই দুর্ধর্ষ ডাকাত নীলু আর ভুলু। সকলের ত্রাস তারা। তা সেবার তারা একলা পেয়ে মা সারদাকে অপহরণ করে বেঁধে রাখে তাদের আস্তানায়।

নিজেদের কাজ সেরে ডেরায় ফিরে দেখে তারা, নেই— মা সারদা সেখানে নেই। তাঁর পরিবর্তে বাঁধা রয়েছেন স্বয়ং মা-কালী। দেখে তো নীলু-ভুলুর আক্কেল গুড়ুম। এ কাকে অপহরণ করেছে তারা! এযে স্বয়ং মা কালী।

ভয়ে, ভক্তিতে দুই ডাকাত সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেয় মায়ের বাঁধন। কেঁদে কেঁদে বারবার ক্ষমা চায় তারা। তারপর পৌঁছে দেয় তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের পথে।

নীলু-ভুলু ছিল তারকেশ্বর অঞ্চলের ডাকাত। তারা যে কীভাবে চেতলায় আস্তানা গেড়ে সেখানে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠিত চেতলার সেই কালীমন্দির আজও আছে। কলকাতার বুকে ডাকাত কালীর ওই মন্দির ঘিরে রয়েছে নানা অলৌকিক কাহিনি।

দুর্গাপুর ব্রিজ পার হয়ে ১৯নং চেতলাহাট রোডে রয়েছে নীলু-ভুলুর ওই ডাকাত কালীর মন্দির। মন্দিরে মা কালীর মূর্তির উচ্চতা প্রায় ৩৪ ফুট। অসুর মুণ্ডের ওপর মা কালী অবস্থান করছেন শিবসহ। বিরাট বিরাট লোহার শেকল দিয়ে দেবীর হাত-পা বাঁধা।

এইভাবে দেবীর অবস্থান অবশ্যই বিস্ময়ের। শোনা যায়, মা কালী নাকি মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘোরাফেরা করতেন। তাই তাঁকে স্থির রাখতেই ওই লোহার শিকলের বাঁধন। কেউ কেউ বলেন, মা সারদাকে অপহরণ করে বেঁধে রেখেছিল এবং সেখানে মা সারদার বদলে মা কালীকে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাওয়ার কারণেই তারা এই ভাবে দেবীমূর্তিকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে এবং সেই রীতিই এখনও চলে আসছে।

তারকেশ্বরের নীলু-ভুলু ডাকাত চেতলায় কেন কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করে তা ঠিক জানা যায় না। মা সারদাকে অপহরণের কথারও তেমন কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না। তবুও লোকশ্রুতিতে এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মা সারদা আর ডাকাত নীলু-ভুলুর নাম।

এসব কাহিনির সত্য-মিথ্যে যাচাই করা খুবই কঠিন। তবে মা সারদাকে যে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর বহু ভক্ত মা কালী হিসেবে দর্শন করেন সে সব কথা রয়েছে নানা লেখায়। আর তার থেকেই ভক্তমননে জননী সারদা বিশ্বজননী কালী হিসেবেই আজ পূজিতা মন্দিরে-মন্দিরে। ☐

ত্রিপুরার মাতাবাড়ির দীপাবলী উৎসব

অপু সাহা

যখন কার্তিক মাসের অমাবস্যা রাত্রি নেমে আসে, তখন যেন সমগ্র উত্তর গোলার্ধ অন্ধকারে ঢেকে যায়। কিন্তু ঠিক সেই রাতেই ভারতভূমিতে জ্বলে ওঠে অসংখ্য প্রদীপ, দীপাবলীর শিখা— যা জানিয়ে দেয়, অন্ধকার যত গভীরই হোক, আলোর জয় অনির্বার্য। দীপাবলি কেবল একটি উৎসব নয়, এটি আলো, বিশ্বাস ও মানবতার অমর জ্যোতি।

পৌরাণিক কাহিনিতে বলা হয়েছে, ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে অযোধ্যায় ফিরে আসার পর অযোধ্যাবাসীরা প্রদীপ জ্বালিয়ে শহর আলোকিত করে শ্রীরাম, মাতা সীতা ও লক্ষ্মণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই দিন থেকেই দীপাবলী উৎসবের শুরু। আবার অন্য মতে, এই দিনেই সমুদ্র মন্থনের সময় বা লক্ষ্মী আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি শান্তি ও সমৃদ্ধির দেবী। তাই দীপাবলী কেবল আনন্দের উৎসব নয়— এটি শুভ শক্তির জয়গাথা।

এই পবিত্র দীপাবলীই যখন উদ্‌যাপিত হয় ত্রিপুরার মন্দিরনগরী উদয়পুরের মতাবাড়িতে, তখন তো যেন হয়ে ওঠে স্বর্গের এক ঝলক পৃথিবীতে। মাতাবাড়ি— যেখানে অধিষ্ঠিত মা ত্রিপুরাসুন্দরী, দেবী শক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

তিন দিন ধরে চলে এই উৎসবের আবেশ। মাতাবাড়িতে দীপাবলীর পূজার নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোহিত সঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, তান্ত্রিক মতে মায়ের পূজার্চনা হয়। দীপাবলীর দিন ভোর ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত চণ্ডীপাঠ হয়। সকাল ৮টায় মাকে স্নান করানো হয় এবং ৯.৩০-এ মায়ের নিত্য পূজা শুরু হয়। দুপুর ১২টায় প্রথমে মহারাজার নামে পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়। দু'দিনের জন্য পুষ্পাঞ্জলির আয়োজন স্থগিত থাকে। দুপুর ১.৩০-এ মাকে অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। অন্নভোগের পর ১ ঘণ্টার জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা হয়। ৩টায় ভক্তদের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা হয়। শুধুমাত্র দীপাবলীর জন্য আবার স্নানের পর মাকে নতুন বস্ত্র, অলংকার দিয়ে সাজানো হয়। মায়ের অপরূপ দর্শন ভক্তদের মনকে মোহিত করে, হৃদয়ে ভক্তি ও শান্তির আলোকস্রোত বয়ে আনে। স্নানের পর সন্ধ্যারতি শুরু হয়। উলুধ্বনি ও ঢাকের শব্দে চারদিক ভরে ওঠে। প্রার্থনার সুর, ভক্তির ছন্দ ও আনন্দ উদ্‌যাপনের এক অমলিন আভা, যা হৃদয়কে ভরে দেয় পবিত্রতা ও আনন্দে। প্রথমে দীপাবলীর পূজা তারপর শ্যামা মায়ের পূজা। শ্যামাপূজার পর বলি দেওয়া হয়। এরপর হোম যজ্ঞ। হোম যজ্ঞের পর মাকে শীতল ভোগ নিবেদন করা হয়। এরপর ৫ মিনিটের জন্য মন্দিরের দরজা সামান্য বন্ধ রাখা হয়।

কার্তিক অমাবস্যার সেই রাতে মন্দির, মন্দির প্রাঙ্গণ এবং সমগ্র উদয়পুর শহর আলোকিত হয়ে ওঠে অসংখ্য প্রদীপে। বাতাসে ধূপের গন্ধ, ভজনের সুর, আর আরতির শঙ্খধ্বনি মিলেমিশে যেন তৈরি করে এক নৈসর্গিক পরিবেশ। চারদিকের আলোর রাশি যেন ঘোষণা করে— 'মা এসেছেন, আশীর্বাদ দিচ্ছেন তাঁর সন্তানদের।'

দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত এই সময় উদয়পুরে আসেন। কেউ আসে পাহাড় পেরিয়ে, কেউ নদী পার হয়ে— কেবল এক ঝলক মায়ের দর্শনের জন্য। তাঁদের চোখে থাকে অগাধ ভক্তি, কণ্ঠে থাকে মন্ত্রধ্বনি, আর অন্তরে থাকে অনন্ত আশার আলো। এই মিলনমেলা, ধর্ম, জাতি ও ভাষার সীমানা পেরিয়ে সবাইকে একাত্ম করে মাতৃভক্তির স্রোতে। এই দীবাবলী আমাদের শোখায়, যেমন— প্রদীপ জ্বালিয়ে মানুষ অন্ধকার দূর করে, তেমনই আমাদের হৃদয়ে জ্বালাতে হবে সত্য, শুভ ও প্রেমের আলো। মা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদে যেন আমরা প্রত্যেকে আলোকিত হই— ভালোবাসায়, ন্যায়ে ও মানবতায়। □

বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘের প্রচারক পরম্পরা

অদ্বৈতচরণ দত্ত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক পরম্পরা হলো রাষ্ট্রহিতে কাজ করার এক ব্রত। সুপ্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে বহু মানুষ রাষ্ট্র সেবা ও রাষ্ট্ররক্ষার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। অতীতকালের কথা ছেড়ে দিলেও, ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর থেকে আমাদের দেশের শত শত যুবক-যুবতী রাষ্ট্ররক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সঙ্ঘ এই পরম্পরারই ধারক। সঙ্ঘের প্রচারক ঠিক সন্ন্যাসী নয়, পণ্ডিত দীনদয়ালজীর কথানুসারে 'ন্যাসী' অর্থাৎ অছি। রাষ্ট্রহিতে সদাজাগ্রত প্রহরী। সমাজের সার্বিক বিকাশে—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবা, সংস্কার অর্থাৎ যা কিছু আবশ্যক তা স্বয়ংসেবকরা প্রচারক হিসেবে করে চলেছেন। রাষ্ট্রহিতই সঙ্ঘের ধ্যেয়। ব্যক্তি নির্মাণের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম, হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুসমাজের সংরক্ষণ করে হিন্দুরাষ্ট্রকে পরম বৈভবশালী করাই সঙ্ঘের ব্রত। এ ব্রতপালনে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁরাই প্রচারক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯২৫ সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারকে স্বয়ংসেবকেরা 'আদ্য সরসঙ্ঘচালক' হিসেবে প্রণাম জানান। তাই প্রচারক বলতে যা বোঝায়, সেই প্রচারক পরম্পরা শুরু হয়েছে বাবাসাহেব আপ্তের সময় থেকে। বাবাসাহেব আপ্তে সঙ্ঘের প্রথম প্রচারক। তিনি সঙ্ঘের কাজের বিস্তারের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়েছেন। বঙ্গপ্রদেশে নিয়মিত এসেছেন। খড়্গপুরে তখন কেশব গোরে নামে এক বিদ্যার্থী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রচারক হিসেবে অখিল ভারতীয় ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর বাবা কুন্টেজী কর্মসূত্রে খড়্গপুরে থাকতেন। ডাক্তারজী (ডাঃ হেডগেওয়ার) ১৯৩৭ সালে খড়্গপুরে তাঁকে কেন্দ্র করে শাখা শুরু করেন।

অমল কুমার বসু

কেশবরাও দীক্ষিত

বংশীলাল সোনী

তিনি ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সাল ডাক্তারি পড়বার জন্য কলকাতায় ছিলেন। সেসময় বন্যাপীড়িতদের সেবার কাজে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এই সেবাভাবনা নিয়ে অনেক যুবক সঙ্ঘের কাজে যোগ দিয়েছেন। সঙ্ঘকে সংক্ষেপে আর এস এস বলা হয় অর্থাৎ রেডি ফর সেলফ্‌লেস সার্ভিস। বঙ্গে সঙ্ঘের কাজের জন্য ১৯৩৯ সালে নাগপুর থেকে এসেছিলেন বালাসাহেব দেওরস—যিনি পরে সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক হয়েছিলেন। কলকাতার মানিকতলায় তিনি শাখা শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শাখায় সামরিক কায়দায় (গার্ড অব অনার) সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজে প্রথম দিকের প্রচারক হিসেবে শ্রীরামপ্রসাদ দাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত বেঁটেখাটো চেহারার এই মানুষটি সঙ্ঘের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচারক হিসেবে স্বদেশ ও হিন্দু সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি প্রথমে ব্যারাকপুরে সঙ্ঘের কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আগ্রহে ভারতীয় জনসঙ্ঘের কাজে যুক্ত হন। এরপর তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা হিসেবে আলিপুরদুয়ার জেলার হাতিপোতা গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বসন্তরাও ভট্ট, মাধবরাও বনহাট্টি, বংশীলাল সোনী, অনন্তলাল সোনী, দেবব্রত সিংহ প্রমুখ প্রবীণ প্রচারক তাঁকে এই কাজে সহায়তা করেছিলেন।

বঙ্গভূমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণধূলি ধন্য। বঙ্গের বহু যুবক তখন থেকেই নিঃস্বার্থভাবে সমাজের রক্ষা ও কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মহাপুরুষের প্রেরণায় বহু যুবকই রামকৃষ্ণ

ফঃ ৫

মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-সহ বিভিন্ন ধর্মীয়, সেবা ও সামাজিক সংগঠনের কাজে নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেসময় মহরাষ্ট্র থেকে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে মাধবরাও বনহাট্টি এসেছিলেন এবং বাঁকুড়ায় সঙ্ঘের কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার অভিযোগে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো বাঁকুড়াতেও স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে তিনি সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন।

১৯৪০ সালে নাগপুরে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ (ওটিসি) থেকে ফিরে কালিদাস বসুও প্রচারক হিসেবে প্রথমে নবদ্বীপে এবং পরে কলকাতায় সঙ্ঘের কাজ করেন। ১৯৪৯ সালে কলকাতাকে কেন্দ্র করে একনাথ রাণাডে কাজ শুরু করেন। তিনি অন্যান্য প্রদেশ থেকে বঙ্গে সঙ্ঘের কাজের জন্য বেশ কয়েকজন (১৬ জন) প্রচারককে নিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম অমল কুমার বসু যিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক, প্রান্ত কার্যবাহ ও প্রান্ত সঙ্ঘচালক হিসেবে কাজ করেছেন। নাগপুরে সঙ্ঘের প্রথম কাজ শুরু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নাগপুর তথা মহারাষ্ট্র থেকেই বেশি সংখ্যায় সঙ্ঘের প্রচারকরা এসেছেন। অন্য প্রদেশ যেমন উত্তরপ্রদেশের বেরিলি থেকে বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য, যাঁকে আমরা রতনদা বলে চিনি, তিনি কলকাতা মহানগর প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছিলেন।

বহু প্রচারক পশ্চিমবঙ্গে এসে এখানকার একজন আত্মীয়স্বরূপ হয়ে গেছেন। যখন সঙ্ঘকে কেউ জানত না, সঙ্ঘ কাজের প্রচার প্রসার ব্যাপক ছিল না, সঙ্ঘের কাজ করা কঠিন ছিল, সঙ্ঘকাজের কথা বললে মুখ ফিরিয়ে নিত, তখন কয়েকজন দেবদুর্লভ কার্যকর্তা এসে পথনির্দেশ করেছেন। আজ সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্ণ হলো, দেশের তথা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অঞ্চলে গ্রামে-নগরে বহু স্পর্শকাতর অঞ্চলেও হিন্দু সমাজ জাগ্রত হচ্ছে। সেখানেও সঙ্ঘের বিস্তারক, প্রচারকরা পৌঁচে গেছেন।

আমাদের এই বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘ কাজের প্রথম দিকে মারাঠি যুবক স্বয়ংসেবকেরা এসেছেন। কিন্তু তাঁরা কাজ করতে করতে বাঙ্গালি হয়ে গেছেন। এসেছেন গোয়ালিয়র থেকে বসন্তরাও ভট্ট। এক দিব্য পুরুষ, মৌন তপস্বী। পরে হয়ে গেছেন সকলের প্রিয় বসন্তদা। তাঁর জন্মভূমি গোয়ালিয়র, কিন্তু কর্মভূমি মোক্ষভূমি হয়েছে বঙ্গভূমি। এখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বসন্তদা পোশাকে, আচরণে, ব্যবহারে একজন পুরোপুরি বাঙ্গালি হয়ে গিয়েছিলেন। কর্মযোগী বসন্তদার সান্নিধ্য লাভ করে বহু যুবক-যুবতী প্রচারক বা কল্যাণ আশ্রমের পূর্ণকালীন রূপে এই রাজ্যের কাজে যুক্ত হয়েছেন। বিলাসবাহুল্যহীন অতি সাধারণ, প্রসিদ্ধি বিমুখতার মূর্তি বসন্তদা।

এসেছেন মাধব রাও বনহাট্টি--- একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক। সহজে সকলকে আপন করে নিতে পারতেন। সবার প্রিয় মাধবদা হয়ে গিয়েছিলেন। মাধবদার অমায়িক আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহার ঘরের মা-বোনেরাও সঙ্ঘের কাজকে জেনেছে, বুঝতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে। তাই অনেকে যুক্ত হয়েছে সঙ্ঘের কাজে। মাধবদার কার্যক্ষেত্র ছিল বাঁকুড়া থেকে উত্তরবঙ্গ। পরবর্তীকালে মরিশাসে অনেক দিন কাজ করার পর আবার এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে কাজ করেন। মৃত্যুর সময় আমাদের বলেছেন—'দেখ অদ্বৈত, আমি পশ্চিমবঙ্গের আরএসএসের ক্যাডার।'

এসেছেন গজানন বাপট। অনেকেই তাঁকে ডাকতেন 'গজাননদা' বলে। এক কট্টর মারাঠি যুবক। বলিষ্ঠ চেহারা। কথায় ও কাজে চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশ পেত। নবদ্বীপ বিভাগ, শিলিগুড়ি বিভাগে দারুণ কুশলতার সঙ্গে কাজ করেছেন। গজাননদা সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে দাপুটে মুখ্যশিক্ষিক ছিলেন। তাঁর গর্জনের মতো কণ্ঠস্বরে শিক্ষার্থীদের অনুশাসন পালনে সচেতন করত। বিনোদ সভাতে শিক্ষার্থীরা গান রচনা করেছিল--- 'গজানন বাপট দেখায় বড় দাপট।' মনে পড়ে কল্যাণী শিবিরের প্রস্তুতির সময় দীর্ঘ তিনমাস মাঠে পড়ে থেকে থেকে আঠারো হাজার স্বয়ংসেবকদের থাকার জন্য শিবিরের ব্যবস্থা রচনা করেছিলেন। তিনমাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করে শিবিরকে সফল করেছেন। ১৯৯২ সালে কল্যাণী শিবিরের রূপকার গজানন বাপট--- একথা সকলে জানেন। পরবর্তীতে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে বনবাসী সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে গিয়েছেন।

মহারাষ্ট্র থেকে বাঁকুড়া এসেছিলেন দামোদর সালোডকর। প্রচণ্ড পরিশ্রমী। রোজ পঞ্চাশ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে পুরো বাঁকুড়া ঘুরে বেড়িয়েছেন। একদিকে অপরিচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, অন্যদিকে উদাসীন, চৈতন্যহীন হিন্দু সমাজ। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সঙ্ঘের কাজ শুরু ও গতি পায় বাঁকুড়ায়।

কলকাতায় এসেছিলেন কালিদাস সালোটকর, ভালচন্দ্র গোখলে, প্রভাকর লাখে, বসন্ত বাপট।

অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে এসেছিলেন কে. রঙ্গনাথন। আইন পাশ করা শিক্ষিত যুবক। স্বপ্নে দেখলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। কে. রঙ্গনাথন হয়ে গেলেন রাঙাদা। জরুরি অবস্থায় প্রচারক রাঙাদা স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহীদের জন্য কালো কোট গায়ে দিয়ে ওকালতি করেছেন। পরবর্তীতে রাঙাদা কিষাণ সঙ্ঘের দায়িত্ব দীর্ঘদিন পালন করেছেন। তাঁকে দেখলে মনে হতো একজন বাঙ্গালি গরিব মজদুর চাষি। সকলেই কে. রঙ্গনাথনকে 'রাঙাদা' বলেই ডাকতেন।

কলকাতার ধনাঢ্য সোনী পরিবার থেকে দুই ভাই বংশীলাল সোনী ও অনন্তলাল সোনী প্রচারক হিসেবে বের হলেন। যেমন করে স্বাভিমানী নরেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছেন, তেমনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রেরণাতেই বহরমপুরের আরও এক পরিবারের দুই ভাই ও তিন বোন গৃহত্যাগী হলেন। ডাঃ দেবব্রত সিংহ ও সত্যব্রত সিংহ সঙ্ঘ

প্রচারক এবং তিন বোন সন্ন্যাসিনী হয়েছেন।

পরিবার ছেড়ে কাজ করার জন্য এরাজ্যে অনেক যুবক যাঁর জন্য প্রেরণা পেয়েছেন তাঁর নাম ধরমচাঁদ নাহার। কলকাতার বড়বাজার থেকে প্রচারক বেরিয়েছেন। আসলে তিনি রাজস্থানের মানুষ। ধরমচাঁদ নাহার হয়ে গিয়েছেন ধর্মদা। বাঁকুড়া-মেদিনীপুর বিভাগ প্রচারক এবং পরে প্রান্ত শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ। তারপর উত্তর-পূর্ব ভারত। শেষ জীবন হরিয়ানাতে সফল প্রচারক হিসেবে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ধর্মদা আজও অমর।

জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রচারক হিসেবে এসেছিলেন। তাঁর ভাই রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রচারক ছিলেন। জীতেনদার লেখা অমর কাহিনি ‘হে রাজা শিবাজী’ ৩ খণ্ডের পুস্তক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও অনেকে প্রচারক হিসেবে অন্য প্রদেশে গিয়ে সঙ্ঘকাজের বিস্তার ও দৃঢ় করেছেন। এক সময় প্রায় ১৫-১৬ জন উত্তর-পূর্ব ভারত, পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশে কাজ করেছেন।

গণেশ দেবশর্মা (হাওড়ার গণেশ দেবনাথ) ত্রিপুরার প্রচারক হিসেবে গিয়েছিলেন। জীবনের পঁচিশটি বছর সেখানে অতিবাহিত করেছেন। সেখানকার সমাজের লোকের সঙ্গে কাজ করার সুবিধার জন্য গণেশ দেবনাথ হয়ে যান গণেশ দেবশর্মা।

ক্ষেত্র কার্যবাহ শ্যামল সেনগুপ্ত-সহ তিন প্রচারককে আজও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভুলতে পারেনি। ত্রিপুরায় আজ সঙ্ঘকাজের অনুকূলতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অনেক কার্যকর্তার বলিদান, বিশেষ করে চারজন যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়েছিলেন—শ্রী শ্যামল সেনগুপ্ত, সুধাময় দত্ত, দীনেন দে ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী—খ্রিস্টান জঙ্গি সংগঠন NLFT তাদের অপহরণ করে হত্যা করে। তাঁরা আমাদের কাছে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন।

দেবব্রত সিংহ

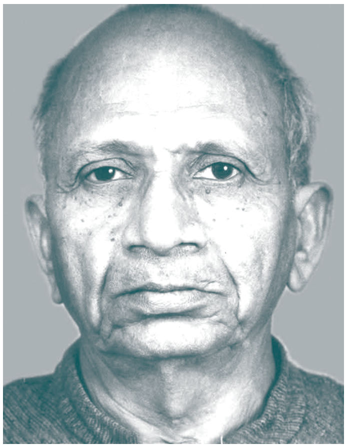
মাধব বনহাট্টি

অনন্তলাল সোনী

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রচারকদের মনে রাখতে হবে, লোক সংগ্রহ, লোক সংস্কার ও লোক নিয়োজন---এটাই সঙ্ঘের কাজ। ডাক্তারজী এই কাজই আমাদের দিয়েছেন। ডাক্তারজীর শিক্ষা-সংস্কার-কর্মের পীঠস্থান এই বঙ্গভূমি। ডাক্তারজীর অমর বাণী---‘দেশের জন্য বাঁচতে শেখ।’

আজ আবশ্যক শতবর্ষের সাধনায় জাতির স্ব-কে রক্ষা করা। এক স্বাভিমানী সমাজ গড়ে তোলা। আমাদের লক্ষ্য, আমাদের ধ্যেয়—রাষ্ট্র সাধনা।

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজে বহু বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক যুবকই আজ প্রচারক হিসেবে যোগ দিতে এগিয়ে এসেছেন। ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে পূজনীয় তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেবজীর আহ্বানে ১১১ জন স্বয়ংসেবক প্রচারক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, অনেক পরিবারই সানন্দে তাদের সন্তানকে এই পুণ্যকাজে যোগ দেওয়ার জন্য সম্মতি জানিয়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে দুশোরও বেশি প্রচারক সঙ্ঘের আদর্শের বিস্তারে ব্যাপৃত আছেন। এতদিন অন্য প্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজের জন্য প্রচারকেরা এলেও এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকেই সঙ্ঘের প্রচারকেরা অন্যপ্রদেশে যেমন, ত্রিপুরা, অসম, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে গিয়ে সঙ্ঘ কাজ করছেন। এই প্রচারক পরম্পরা, যাকে আমরা ঋষি পরম্পরা বলে থাকি, তা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সারা দেশে প্রায় ৩৫০০ প্রচারক এখন কর্মরত। প্রচারকরা ইচ্ছা করলে বাড়িতে ফিরে গিয়ে গৃহস্থ জীবনযাপন করেও সঙ্ঘের কাজ করতে পারেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে সঙ্ঘকাজ করছেন এমন সংখ্যাও এখন কয়েক হাজার। এছাড়া রয়েছেন পূর্ণকালীন কার্যকর্তা। হিন্দুত্বকে সামনে রেখে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কর্মকাণ্ড চলেছে, সেই কাজেও প্রায় ৫০০০ পূর্ণকালীন কার্যকর্তা ঘরে বা বাইরে বিবাহিত বা অবিবাহিত থেকে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য)

মহারাষ্ট্র মণ্ডলের পরিবেশবান্ধব গণপতি পূজা।

পঞ্চপরিবর্তন

পরিবেশ সংরক্ষণ ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

যোগিনী বাপট

পরিবেশ সংরক্ষণ হিন্দু সমাজের জন্য কোনো নতুন ধারণা নয়, বরং এটি আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা। আমাদের বেদ, উপনিষদ ও পুরাণে প্রকৃতি পূজার বিধান আছে। সূর্য, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীকে দেবতা রূপে পূজা করে তাঁদের আরাধনা করা হয়। অথর্ববেদে উল্লেখ রয়েছে— 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহম্ পৃথিব্যাঃ' শ্লোকটি এই সত্য প্রকাশ করে যে, পৃথিবী আমাদের মা আর আমরা তাঁর সন্তান। তাঁর সুরক্ষা করা আমাদের প্রথম কর্তব্য। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সর্বদা এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন, যতটুকু প্রয়োজন ততটাই নিয়েছেন এবং প্রকৃতিকে ফেরত দেওয়ার মনোভাব রেখেছেন। এটাই তো প্রকৃত অর্থে স্থায়ী উন্নয়ন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৃক্ষ ও নদীকে দেবতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তুলসী, অশ্বত্থ, বটের মতো বৃক্ষের পূজা হিন্দুদের প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীলতার প্রতীক।

আজ প্রয়োজন আমরা যেন আমাদের শিকড়ে ফিরে যাই, যেখানে অপচয় নয়, সংযম; প্রদর্শন নয়, সরলতা। আমাদের পাশ্চাত্যের অনুকরণ করার প্রয়োজন নেই। কারণ পরিবেশের প্রতি দায়িত্ব আমাদের সংস্কারে গভীরভাবে নিহিত। 'সবুজ ভারত'-এর স্বপ্ন তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন আমরা ভারতীয়তার সেই মূল উপাদান, —'প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান' আবার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করব। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ উদ্যোগে জল, বায়ু, ভূমি ও বৃক্ষের সংরক্ষণে মনোনিবেশ করেন, তবে পৃথিবী পুনরায় সবুজ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। প্রতিটি ঘরই হবে 'সবুজ ঘর'।

পরিবেশ সংরক্ষণের অর্থ হলো আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদ— যেমন বায়ু, জল, মাটি, বন ও প্রাণীজগতের সুরক্ষা করা এবং তার ভারসাম্য বজায় রাখা। এর উদ্দেশ্য হলো দূষণ রোধ করা, সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহার করা এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশব্যবস্থা গড়ে তোলা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিত্রী মা আমাদের লালন-পালন ও রক্ষা করে আসছেন। কিন্তু আজ মানুষের লোভ, অন্ধ শিল্পায়ন, নির্বিচারে বন ধ্বংস, বায়ুদূষণ সেই ভারসাম্যকে নষ্ট করেছে। এখন প্রশ্ন ওঠেছে, আমাদের কি পৃথিবীকে রক্ষা করা দায়িত্ব নয়? বাস্তবতা হলো, প্রকৃতি মানুষ ছাড়াও টিকে থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ প্রকৃতি ছাড়া টিকতে পারে না। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ কোনো বিকল্প নয়, এটি আমাদের জীবনের প্রয়োজন।

আজ পৃথিবী গভীর সংকটে নিমজ্জিত। গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বন ধ্বংস, হিমবাহ গলে যাওয়া এবং বায়ু দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তনকে ভয়ংকর করে তুলেছে। বন্যা, খরা, দাবানল ও ঘূর্ণিঝড় এখন সাধারণ ঘটনা। এগুলো আমাদের প্রতি প্রকৃতির সতর্কবার্তা। আমাদের প্রতি এই সংকটের মূল কারণ আমরাই। আমরা জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়াই, অতিরিক্ত প্লাস্টিক ব্যবহার করি, অরণ্য ধ্বংস করি, নদী দূষিত করি। ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।

হ্যাঁ, আমরাই দায়ী। যে আবর্জনা আমরা ফেলি, যে সম্পদ আমরা

অপচয় করি, সব মিলেই আজকের পরিবেশ সংকটের জন্ম দিয়েছে।

'উৎসস্থলে আবর্জনা পৃথকীকরণ'-এর হলো, আমরা বাড়ি বা অফিসেই তিনভাবে আবর্জনা আলাদা করব— ভিজে আবর্জনা, শুকনো আবর্জনা এবং ক্ষতিকর আবর্জনা। ভিজে আবর্জনা থেকে কম্পোস্ট বা সার তৈরি করা যায়, শুকনো আবর্জনা পুনর্ব্যবহার করা যায় এবং ক্ষতিকর আবর্জনাকে নিরাপদভাবে পুনর্নবীকরণ করা যায়। যখন আমরা আবর্জনাকে সঠিকভাবে আলাদা করি, তখন তা দূষণ নয়, বরং সম্পদে পরিণত হয়। এটি 'স্বচ্ছ ভারত' ও 'আবর্জনা মুক্ত সমাজ'-এর দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

'আবর্জনা থেকে সম্পদ'-এর ধারণা শেখায় যে, প্রকৃতিতে কিছুই নষ্ট হয় না। সবকিছু পুনরায় ব্যবহার বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য। জৈব আবর্জনা থেকে সার ও বায়োএনজাইম তৈরি করা যায়, যা প্রাকৃতিক ক্লিনার হিসেবে কার্যকর। প্লাস্টিক, কাঁচ ও কাগজ পুনর্ব্যবহার করে নতুন পণ্য তৈরি করা যায়। এতে শুধু দূষণই কমে না, শক্তি ও সম্পদেরও সাশ্রয় হয়। এভাবে আমরা 'পরিপূর্ণ অর্থনীতি'-র দিকে এগিয়ে যেতে পারি, যেখানে কিছুই অপচয় হয় না।

প্রতেক ব্যক্তি পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারেন। কিছু ছোটো পদক্ষেপ বড়ো পরিবর্তন আনতে পারে :

- আবর্জনা আলাদা করুন, ভিজে ও শুকনো।
- রান্নাঘরের বর্জ্য থেকে সার তৈরি করুন।
- রাসায়নিক ক্লিনারের বদলে বায়োএনজাইম ব্যবহার করুন।
- একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এড়িয়ে চলুন। কাপড়ের ব্যাগ সবসময় সঙ্গে রাখুন।
- জল সংরক্ষণ করুন।
- অপ্রয়োজনীয় যন্ত্র ব্যবহার বন্ধ রাখুন।
- গাছ লাগান ও তার যত্ন নিন।

অন্যদেরও এই অভ্যাসে উৎসাহিত করুন। ছোটো ছোটো পদক্ষেপ মিলেই বড়ো পরিবর্তন আনে। কোচবিহারের 'সুবজ বিনয়' হাজার হাজার গাছ লাগিয়ে এবং তার পরিচর্যা করে সমাজের কাছে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। মহারাষ্ট্র মণ্ডল কলকাতা, যা তার ১০১ বছর পূর্ণ করেছে, প্রমাণ করেছে যে অধ্যাত্ম ও পরিবেশ সংরক্ষণ একসঙ্গে চলতে পারে। ১০ দিনের গণেশ উৎসবের সময় সংগৃহীত 'নির্মাল্য' (ফুল ও জৈব উপাচার, প্রায় ৩০০ কেজিরও বেশি) ফেলা হয় না, বরং তা কম্পোস্ট ও বায়োএনজাইমে রূপান্তর করা হয়। এই বায়োএনজাইম রাসায়নিক ক্লিনারের প্রাকৃতিক বিকল্প এবং পরিবেশকে দূষিত করে না।

'সবুজ বিনয়'

গণেশ মূর্তির বিসর্জন পরিবেশবান্ধব ট্যাঙ্কে করা হয়, যাতে নদীর দূষণ না ঘটে। উৎসবের সময় সংগৃহীত প্লাস্টিক আলাদা করে পুনর্ব্যবহারের জন্য পাঠানো হয়। এইভাবে মহারাষ্ট্র মণ্ডল, কলকাতা প্রমাণ করেছে, প্রকৃত ভক্তি সেই, যা

মহারাষ্ট্র মণ্ডলের সদস্যদের দ্বারা বৃক্ষরোপণ।

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে ধ্বংস করে না, বরং সুরক্ষা করে।

পরিবেশ সংরক্ষণ এখন কোনো বিকল্প নয়, বরং বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। আমাদের সচেতনভাবে কাজ করতে হবে, স্থায়ী অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করতে হবে। মহারাষ্ট্র মণ্ডল, কলকাতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে— ভক্তি ও দায়িত্বের সংমিশ্রণই সত্যিকারের উৎসব। আমরা এই পৃথিবী আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাইনি, বরং আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে ধার নিয়েছি। 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহহম্ পৃথিব্যাঃ' এই বাণী মানুষ ও প্রকৃতির গভীর সম্পর্ককে প্রকাশ করে। যেমন মা তাঁর সন্তানকে লালন করে, তেমনি পৃথিবী আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু দেয়— অন্ন, জল, বায়ু ও আশ্রয়। তাই পৃথিবীর প্রতি আমাদেরও কর্তব্য— তাঁকে রক্ষা করা, সম্মান করা এবং দূষণ থেকে বাঁচানো। এই বাণী আমাদের শেখায় স্থায়ী জীবনের মূলমন্ত্র— যতটুকু প্রয়োজন ততটাই নিন এবং যতটা সম্ভব প্রকৃতিকে ফেরত দিন। সঙ্ঘের শতবর্ষে স্বয়ংসেকরা পঞ্চপরিবর্তনের বার্তা নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে উপস্থিত হবেন। পরিবেশ সংরক্ষণ তার মধ্যে একটি।

(লেখিকা পরিবেশ সংরক্ষণ গতিবিধির কার্যকর্ত্রী)

এযুগের ইন্দ্রপ্রস্থ মাওলিননং

পাণ্ডবদের ওপর যথেষ্ট অবিচার হয়েছে— দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল এই বার্তা। কুরুবংশের সম্মান যায় যায় অবস্থা। শেষমেশ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্ররেদের ডেকে অর্ধেক রাজত্ব দেওয়ার নাম করে দান করলেন পর্বতসঙ্কুল ঊষর ভূমি-– খাণ্ডবপ্রস্থ। স্বাভাবিকভাবেই পাণ্ডুপুত্ররা এই তাচ্ছিল্যের দানে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা ফিরিয়ে দেননি তাদের জ্যেষ্ঠতাতের এই দান।

সখা শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় সেই খাণ্ডবপ্রস্থকে ছ'সাত বছরে ইন্দ্রপ্রস্থ বানিয়ে ফেললেন পাণ্ডবরা। চাকচিক্যে, জাঁকজমকে, ঐশ্বর্যে, কৌলিন্যে হস্তিনাপুরকে ছাড়িয়ে গেল ইন্দ্রপ্রস্থ। স্বর্গের মতো শোভমান ইন্দ্রপ্রস্থ হলো কৌরবদের ঈর্ষার লক্ষ্যবস্তু। নগরীটি ভাররতবর্ষের প্রতিটি রাজার ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠল। সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে স্বর্গের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত ইন্দ্রপ্রস্থ মহাভারতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

আজও কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ গড়ে ওঠে। কাজের মধ্যে দিয়ে বেঁচে আছে পাণ্ডবরাও। পৃথিবীর নানা প্রান্তে, দিকে-দিকে, গ্রাম ও শহরে, বনেজঙ্গলে, রুক্ষ পাহাড়ে, বা মরুপ্রান্তে কাজ করে চলেছে নবরূপে পাণ্ডবের দল। 'ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল। ওর মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে। ওরা কাজ কারে নগরে-প্রান্তরে।' তাই এখনো গড়ে ওঠে ইন্দ্রপ্রস্থ।

উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয়ের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে আছে একটি ছোট্টো সুন্দর গ্রাম---মাওলিননং। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গর্বের এই গ্রাম এশিয়া মহাদেশের সবচাইতে পরিষ্কার গ্রামের মর্যাদা লাভ করেছে। ২০০৩ সালে ডিসকভারি ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনের মাধ্যমে এই শিরোপা এলেও এর পথ চলা শুরু হয়েছিল আরও অনেক আগে থেকে, যা আজও অক্ষুণ্ণ। গ্রামের মানুষের চেতনা ও শিক্ষার ফল যে কী হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছে ভারতের এই নব ইন্দ্রপ্রস্থটি।

মাওলিননং গ্রামের একশো ভাগ মানুষই শিক্ষিত। সচেতনতার পাঠ শুরু হয় শৈশব থেকেই। শিশুরা ঘুম থেকে উঠে আগে নিজের ঘর ও বাড়ির চারপাশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অংশ নেয়। তারপর স্কুলে যায়। কোথাও কোনো আবর্জনা পড়ে থাকলে কেউ না কেউ সেটি সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেয় রাস্তার পাশে রাখা বাঁশের তৈরি ডাস্টবিনে। গ্রামে প্লাস্টিকের ব্যবহার ও ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই প্রচেষ্টায় পাহাড় ঘেরা এই ছোট্ট গ্রামটির মাটি, জল, বাতাস একেবারে স্বচ্ছ, দূষণমুক্ত। মানুষের সচেতনতা এতটাই যে, বাড়ি তৈরির আগে তৈরি হয় শৌচাগার। গ্রামের একশো ভাগ গ্রামবাসীই স্যানিটেশনের আওতাভুক্ত।

অজয় ভট্টাচার্য

জাতীয় উদ্যান

মান্নার উপসাগরীয় সামুদ্রিক জাতীয় উদ্যান

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সামুদ্রিক জীবমণ্ডল সংরক্ষণাগার এই উদ্যান জীববৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল। মোট ২১টি দ্বীপ নিয়ে , ৫৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই উদ্যানে রয়েছে মোহনা, সমুদ্রসৈকত, বালি, কাদা, মাটি যা এই এলাকাকে সুন্দর পরিবেশে দান করেছে। এখানে ১১ প্রজাতির সামুদ্রিক ঘাস, ১৪৭ রকমের প্রবাল, ৫ প্রজাতির কচ্ছপ, ৫১০ প্রজাতির মাছ, ১০৬ প্রজাতির কাঁকড়া-সহ ৩৬০০ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে। এর কাছাকাছি দর্শনীয় স্থান হলো ধনুষ্কোডি সমুদ্র সৈকত, শ্রীরামসেতু, ক্রুসাদাই দ্বীপ, ভাট্টাকোট্টাই দুর্গ, মুরুগণ মন্দির, কন্যাকুমারী সমুদ্র সৈকত, বিবেকানন্দ শিলামন্দির প্রভৃতি।

এসো সংস্কৃত শিখি-৮৬

দ্বিতীয়া বিভক্তি: পুলিঙ্গ: (ভাগ:-১)

चषक:-चषकम्।

গেলাস— গেলাসকে।

सुधाखण्ड: - सुधाखण्डम्।

दण्ड: -दण्डम्।

दन्तकूर्च: - दन्तकूर्चम्।

ग्रन्थ: - ग्रन्थम्।

अहं चषकम् स्वीकरोमि।

আমি গেলাস গ্রহণ করি।

अहं सुधखण्डम् स्वीकरोमि।

अहं दण्डं स्वीकरोमि।

ভালো কথা

ঠাকুর দেখার আনন্দ

এবার দুর্গাপূজায় ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় আমাদের শাখার সবাই মিলে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। মজার বিষয় হলো ছোটো থেকে বড়ো সবাই আমরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় মানুষ সম্ভ্রমের চোখে আমাদের দেখছিল। আমারা সবাই সাদা ধুতি পরেছিলাম । একমাত্র দীপমাল্য লাল ধুতি আর লাল পাঞ্জাবি পরেছিল। ওর গোলগাল চেহারায় একে খুব ভালো মনিয়েছিল। চওড়া ধুতির পাড়ে নীলদাকে হিরো-হিরো মনে হচ্ছিল। মাঝখানে আমার ধুতি একবার খুলে যাচ্ছিল তখন সুকেশদা ঠিক করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা ছ'টায় বেরিয়ে অনেক ঠাকুর দেখে রাত ন'টায় সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাঠে এসে ঠাকুর দর্শন করে একটু জিরিয়ে নিলাম। তখন দেবব্রতদা আমাদের সবাইকে টিফিন করালেন। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা ধরে যাওয়ায় আমরা সেদিনের মতো ঠাকুর দেখা সমাপ্ত করলাম।

বিষ্ণু ঘোষ, সপ্তমশ্রেণী, টি পি রোড, কলকাতা-৬

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

জীবন মানে লড়াই

মৌমিতা দেবনাথ, নবমশ্রেণী, নিমতা , কলকাতা-৪৯

বাঁচতে হলে লড়তে হবে,
সাহস নিয়ে চলতে হবে,
পড়ে গেলে উঠতে হবে,
হার মানলে থেমে যাবে।
মনে রেখো জীবন তোমার,
স্বপ্ন তোমার, সাহস তোমার।
ভয় পেও না, মন ভেঙ্গো না,
অলসতায় বসে থেকো না।

মানুষ তোমার পাশে যত,
তোমার কাছে শক্তি তত।
অপ্রিয় কথা বললে তবে
মুহূর্তে তারা শত্রু হবে।
তবু হাল ছেড়ো না,থেমে যেও না
আসবে তোমার সুদিন
যে সয় সে রয়, জয় তোমারই একদিন।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

জাতীয় পুনর্জাগরণে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন ও অভিযান

সত্যনারায়ণ মজুমদার

ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির মতো জন্মজাত দেশভক্ত ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ইংরেজ শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার চেষ্টায় সতত যত্নশীল ছিলেন। তৎকালীন সময়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য পরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলন এবং কংগ্রেস দ্বারা সঞ্চালিত স্বরাজ্যের জন্য গণআন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৪০ সাল পর্যন্ত স্বচক্ষে দেশের স্বাধীনতা দেখার জন্য উৎসুক ছিলেন। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যে ভারত বিশ্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র রাষ্ট্রভক্তির অভাব ও অসংগঠিত জাতীয় সমাজের জন্য দেশ বারবার অল্পসংখ্যক বিদেশিদের দ্বারা পরাজিত হয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্ব- মহাযুদ্ধে ইংরেজশক্তি জীবন-মরণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। ডাঃ হেডগেওয়ার এই অবস্থা পর্যালোচনা করে বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজশক্তি ঘোরতর বিপদাপন্ন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দেশ দাসত্বের জাল ছিন্ন করতে সক্ষম হবে কিন্তু স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ভারতের জাতীয় হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করে জাতীয়শক্তি নির্মাণ করতে হবে। সেজন্য ১৯২৫ সালে নাগপুরে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অর্থাৎ হিন্দু সমাজের শক্তি সাধনার কেন্দ্রস্বরূপ শাখা বা হিন্দু সমাজের মিলনক্ষেত্র নির্মাণ করেন। এহেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দীপশিখা যেমন প্রজ্জ্বলিত রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে জাতীয় মেরুদণ্ডকেও সুদৃঢ় করার পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল।

বঙ্গপ্রদেশে এই সঙ্ঘশাখার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ১৯৩৯ সালে সঙ্ঘের দ্বিতীয় পূজ্য সরসঙ্ঘচালক শ্রী মাধব সদাশিব রাও গোলওয়ালকর কলকাতার ১নং সরকার লেনের একটি বাড়িতে। কিন্তু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য ডাক্তারজীর শারীরিক অসুস্থতার ও অনান্য কিছু কারণে চার মাস কলকাতাতে অবস্থান করে তিনি নাগপুর ফিরে যান। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে পুনরায় সঙ্ঘ কার্যের গতি ধরে রাখার জন্য কলকাতাতে বিঠ্ঠল রাও পাতকী প্রচারকরূপে আগমন করেন। ১৯৪০ সাল থেকেই বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, জেহাদি আক্রমণ, দেশবিভাজন, উদ্বাস্তু স্রোত প্রভৃতি সমস্যার কারণে এরাজ্য দীর্ণ হলেও ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ গান্ধীজী হত্যাকাণ্ডের মিথ্যা অজুহাতে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা পর্যন্ত প্রায় সমস্ত জেলাতেই সঙ্ঘকার্য বিস্তৃত হয়। ১৯৪০ সালের পর কালিদাস, সুকুমার ব্যানার্জী, কালিদাস সালোডকর, মুরলীধর নায়েক প্রভৃতি কার্যকর্তাগণ যেমন প্রচারক হিসেবে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যান, তেমনি ঘনশ্যাম দাস বেরিওয়াল, অজিত বিশ্বাস, জয়দেব ঢোলে, বৃন্দাবনধর গোস্বামী,

ফঃ ৬

শরদিন্দু লাহিড়ী, পঞ্চানন ব্যানার্জী, সজল ব্যানার্জী, শচীনদা (হাওড়া), তারাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীররঞ্জন গিরি প্রমুখ তরুণ স্বয়ংসেবক (এই তালিকা দীর্ঘ হওয়ার কারণে প্রত্যেকের নাম দেওয়া সম্ভব হলো না) প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজ নিজ স্থানে সঙ্ঘ কাজের বিস্তার ঘটান।

স্বয়ংসেবকদের হৃদয়ে রাষ্ট্রের প্রতি বিশুদ্ধ নিষ্ঠা পরিপূর্ণ থাকার জন্য জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও জাতীয় সমস্যার সঙ্গে সম্বন্ধিত বিষয়ের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া অতি সহজেই প্রকটিত হয়। এই সমস্ত সমস্যার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সেগুলির সমাধানের জন্য স্বয়ংসেবকেরা যেমন বিভিন্ন প্রকারের আন্দোলন সঞ্চালন করেছে তেমনি জনজাগণের কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় সমাজকে সচেতন করেছে। সঙ্ঘ ও সমাজ সমার্থক হিসেবে এই সমস্ত আন্দোলন ও অভিযান বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিচালনা করলেও কেবলমাত্র ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে সঙ্ঘকে এককভাবে আন্দোলন করতে হয়েছিল। কারণ গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্ঘ যুক্ত এমন এক সংবেদনশীল বিষয়কে উত্থাপন করে কংগ্রেস ও ভারত সরকার সঙ্ঘের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালিয়েছিল তাতে সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে প্রকৃত ঘটনা অবহিত না হওয়ার কারণে বিদ্বেষ ও আক্রোশভাবাপন্ন হয়ে স্বয়ংসেবকদের প্রতি আক্রমণ করে অত্যাচার চালিয়েছিল। যার ফলে তখন সঙ্ঘ সমাজের অন্যান্যদের সহযোগিতা লাভে অসমর্থ হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন ও অভিযানের বিবরণ উল্লেখ করা হলো—

সঙ্ঘকে তিনবার নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে আন্দোলন

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর কুড়ি বছরের মধ্যেই অখিল ভারতীয় সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করলে দেশের শাসন ক্ষমতার পরিচালক কংগ্রেস দলের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পায়। কারণ জওহরলাল নেহরু ভেবেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে সঙ্ঘই কংগ্রেসের বিকল্প হতে পারে। ফলে সঙ্ঘকাজে বাধা ও তার নামে দুর্নাম প্রচার করার জন্য কংগ্রেস সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সঙ্ঘকাজ বন্ধ করার সুযোগ পেয়েছিলেন গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গান্ধী হত্যার মিথ্যা অজুহাতে ভারত সরকার সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করে গান্ধীজীর অত্যন্ত প্রিয় বিষয় সত্য ও অহিংসার সিদ্ধান্তকে বলি দিয়ে অসত্যের প্রচার করে জনতাকে স্বয়ংসেবকদের আক্রমণ করার জন্য উৎসাহ দান করেছিল। 'সঙ্ঘের উপর যে মিথ্যা দোষারোপ করা হয়েছে তা বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। নচেৎ সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে'—এই দাবিকে সামনে রেখে তৎকালীন সরকার্যবাহ প্রভাকর বলবন্ত দানী (ভাইয়াজী দানী)-র নির্দেশে অখিল ভারতীয় স্তরে সঙ্ঘকার্য পুনরায় শুরু করে স্বয়ংসেবকেরা যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকেরাও সেই নির্দেশ পালন করে ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮ থেকে ২২ জানুয়ারি, ১৯৪৯ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করে অমানবীয় অত্যাচার, যন্ত্রণা ও লোমহর্ষক ঘটনার শিকার হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে হাজার হাজার স্বয়ংসেবক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে যে ধৈর্য, পরাক্রম, সহনশীলতা ও দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন তার প্রশংসা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সেদিন যেমন করেছিল, তেমনি সাধারণ জনতাও প্রকৃত তথ্যের জ্ঞান অর্জন করে সঙ্ঘের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ১২ জুলাই ১৯৪৯ সালে এই নিষেধাজ্ঞা নিঃশর্তভাবে সরকার দ্বারা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

এই আন্দোলনের প্রভাব যে সমাজ জীবনে ব্যাপক হয়েছিল তার দুটি উদাহরণ হলো :---(১) ১৯৪৯ সালে আগস্ট মাসে এক নমুনা জনমত (গ্যালপ পোল) গ্রহণের কার্যক্রম হিন্দুত্বের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ কিছু চিন্তক, শিক্ষাবিদ ও ছাত্র সম্মিলিত হয়ে সমগ্র রাজ্যে বুদ্ধিজীবীদের নিকট গিয়ে প্রচার পুস্তিকা প্রদান করে তিনটি বিষয়ে (নীচে দেওয়া) জনমত গ্রহণের জন্য অভিযান সঞ্চালন করে—(১) দেশের নাম ভারত না ইন্ডিয়া, (২) রাজভাষা হিন্দি না ইংরেজি (৩) এবং রাষ্ট্রবন্দনা 'বন্দেমাতরম্' না 'জনগনমন'—এর মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া যায় যে পশ্চিমবঙ্গেও জনতার দৈনিক জীবনে ও চিন্তায় ভাবনা এই তিনটি প্রশ্ন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রায় এক লক্ষ বুদ্ধিজীবী হস্তাক্ষর প্রদান করে নীচের তিনটি উত্তর প্রদান করেন। যেমন, (১) ভারত, (২) হিন্দি (৩) বন্দেমাতরম্।

দ্বিতীয় উদাহরণ হলো--- দেশ বিভাজনের ফলে উদ্বাস্তু স্রোত পশ্চিমবঙ্গে অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকলে ১৯৫০ সালে স্বয়ংসেবকেরা উদ্বাস্তুদের সেবার জন্য 'বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি' গঠন করে। স্বয়ংসেবকেরা উদ্বাস্তু সমস্যার বিষয় প্রচার করে রাজ্যের সর্বত্র অর্থ, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অভিযান সঞ্চালন করলে মানুষ উদার হাতে স্বয়ংসেবকদের বিশ্বাস করে সমস্ত কিছু দান করে। এই দানসামগ্রীর অপ্রতুলতা সত্ত্বেও প্রায় সহস্রাধিক স্বয়ংসেবক রাজ্যে ১৫টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ মাসব্যাপী প্রতিদিন ৮০ হাজার বাস্তুহারা মানুষকে যেমন খাদ্য প্রদান করেছে, তেমনি ১৫০০ গাঁট কাপড় ১ লক্ষ ৫০ হাজার ব্যক্তিকে বণ্টন করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া শিয়ালদহ ও অন্যান্য স্টেশনে রেলগাড়ি ভর্তি করে যে সমস্ত শরণার্থী ভারতে এসেছিল— এমন ১ লক্ষ শরণার্থীকে খাবারের প্যাকেটও সরবরাহ করা হয়েছিল। স্বয়ংসেবকদের নিঃস্বার্থ সেবাভাবের কথা সেদিন পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকা খোলা মনেই প্রচার করেছিল।

দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞা

২৫ জুন ১৯৭৫ সালে আবার পিতার

পথ অনুসরণকারিণী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ক্ষমতার সমস্তরকম অধিকার কুক্ষিগত করার জন্য সঙ্ঘ-সহ আরও কিছু রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করে এবং সঙ্ঘের কার্যকর্তা, স্বয়ংসেবক ও অধিকারীদের অন্বেষণ করে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করে মিসা (MISA) আইনে কারারুদ্ধ করতে থাকে এবং সঙ্ঘের বিরুদ্ধে একতরফা প্রচার মাধ্যমের দ্বারা কুৎসা রটনা করতে থাকে। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার এবং সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে অখিল ভারতীয় স্তরে যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে লোক সংঘর্ষ সমিতি গঠিত হয়, তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সংযোজনায় 'জন সংঘর্ষ সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতির পক্ষ থেকে স্বয়ংসেবকেরা যেমন গোপনভাবে ছদ্মবেশে সর্বস্তরে পত্রক বণ্টন করে প্রচার অভিযান সঞ্চালন করে, তেমনি অন্যদিকে একমাস ব্যাপী সমস্ত জেলাকেন্দ্রে সত্যাগ্রহ আন্দোলন, সভা, অনুষ্ঠান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে হাজার হাজার স্বয়ংসেবক বিভিন্ন হিন্দুত্বপ্রেমী ব্যক্তি ও কিছু রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সঙ্গে কারাবরণ করে। এমন আন্দোলনের ফলে সরকার বিরোধী জনমত গঠিত হচ্ছে বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজের ভুল স্বীকার করে প্রায় দেড় বছর পরে জরুরি অবস্থা এবং সঙ্ঘের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এই আন্দোলনের ফলে যে জনমত সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণে নির্বাচনে কংগ্রেস দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

তৃতীয় নিষেধাজ্ঞা

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে বিদেশি আক্রমণকারী বাবরের নির্দেশে শ্রীরামমন্দির ধ্বংস করে যে কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল তা হিন্দু সমাজ আক্রোশবশত ভেঙে ফেলে। কাঠামো ধ্বংসের অজুহাতে সঙ্ঘের সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক দলকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তার বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিদের সহযোগে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা যে জনজাগরণের কার্যক্রম প্রচারপত্র বিলি ও সভা সমিতি করে সঞ্চালন করেছিল তার ফলে যেমন হিন্দুশক্তি সংগঠিত হয়েছিল। ফলে জনমতও সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ফলে নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য সরকার যে দলিল আদালতে প্রদান করেছিল তা ন্যায়ালয় অগ্রাহ্য করে। ফলে নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে অপ্রভাবী প্রমাণিত হলে ছয় মাসের মধ্যেই সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

জাতীয় শ্রদ্ধার প্রতীকের সম্মানার্থে আন্দোলন

১৯৫২ সালে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা প্রস্তাব গ্রহণ করে যে গোরক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতির এক পবিত্র কর্তব্য এবং গোমাতা জাতীয় শ্রদ্ধার ও ঐক্যের প্রতীক, যার জন্য সমগ্র দেশের জনতার ভাবনাকে সুদৃঢ় করার জন্য অভিযান সঞ্চালন করে ভারত সরকারকে গোহত্যা প্রতিরোধ আইন তৈরিতে বাধ্য করতে হবে।

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘের কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গোরক্ষা অভিযান সমিতি গঠন করে এবং ১৯৫২ সালের গোপাষ্টমী থেকে বিভিন্ন প্রমুখ স্থানে প্রতি জেলায় সভা ও মিছিল করে জনতাকে গোরক্ষার জন্য আহ্বান করা হয় এবং নাগরিকদের প্রস্তাবের পক্ষে হস্তাক্ষর সংগ্রহের অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের জন্য আয়োজিত কার্যক্রমে কলকাতা, বর্ধমান ও শিলিগুড়িতে ব্যাপক জনসমাবেশ হয়। এই কার্যক্রমের সমাপ্তি কার্যক্রম ৭ ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘের জাতীয় সভাপতি ও সংসদে জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার মনোনীত অধ্যক্ষ ব্যারিস্টার নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২০১০ সালে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলায় রথ তৈরি করে স্বয়ংসেবকেরা জেলার প্রায় প্রতি খণ্ডে যাত্রা করে। গো নির্ভর গ্রাম বিকাশের পক্ষে সভা ও বৈঠক করে অভিযান সঞ্চালন করে জনজাগৃতির জন্য। গোরক্ষা, গো-বংশের বৃদ্ধি করে গোদুগ্ধ এবং গোবর সার উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে গ্রামোন্নয়নের এই বার্তাতে গ্রামের জনতা অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে। অখিল ভারতীয় স্তরে এই কার্যক্রমের আহ্বায়ক ছিলেন পূর্বতন অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ সীতারাম কেদিলাই।

দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আন্দোলন

স্বাধীন কোচবিহার রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ি ছিটমহল ভারতের অভিন্ন অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে আপোশ করে পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং শান্তি স্থাপনের প্রয়াসে ভারত সরকার ১৯৫৯ সালে হিন্দু প্রধান এই অঞ্চল প্রণয়নে সচেষ্ট হলে শিলিগুড়ির নবীন প্রচারক মনোমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় বেরুবাড়ি সংগ্রাম সমিতি গঠিত হয় এবং উত্তরবঙ্গব্যাপী ব্যাপক অভিযান ও আন্দোলন শুরু হয়। প্রত্যেক জেলায় জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে ধরনার কার্যক্রম ও সভা বৈঠকাদির আয়োজন করে জনজাগরণের কার্যক্রম চলতে থাকলে এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারত সরকারকে সতর্ক করে। বেরুবাড়ি হস্তান্তরের জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রস্তাব যে দেশের জাতীয় গৌরব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিকূল সে বিষয়ে সাংসদদের কাছেও আবেদন রেখে তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয় এবং এই আত্মঘাতী আইন তৈরির প্রস্তাবকে তাঁরা যেন দৃঢ়তার সঙ্গে

প্রতিরোধ করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাকে নিজেদের পবিত্র কর্তব্য মনে করেন—এই বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়। এই সংবেদনশীল আন্দোলনে সমাজের প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যক্তির সহযোগিতা এবং সমাজের সাধারণ লোকের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখনীয়। যার ফলে বেরুবাড়িতে বসবাসকারী কয়েক হাজার নাগরিকের মনে যে ভয় সৃষ্টি হয়েছিল তা যেমন দূরীভূত হয়, তেমনি ভারত সরকার ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

তিনবিঘা রক্ষার আন্দোলন

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তারা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বাংলাদেশের সীমালগ্ন কুচলিবাড়ি অঞ্চল তিন বিঘাকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করা। কিন্তু এই ভূখণ্ড অর্থাৎ ১৩৮ × ৩৫ বর্গমিটার জমি বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হলে ভারতের নিজস্ব ৩০ হাজার হিন্দুর বাসভূমি ৬৭ বর্গ কিলোমিটার ভূভাগ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য হতো। যার ফলে এই হিন্দু জনসাধারণ নিজের দেশেই উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য হতো। এই অবস্থার প্রতিরোধের জন্য স্থানীয় জনতা স্বয়ংসেবকদের প্রচেষ্টায় কুচলিবাড়ি সংগ্রাম সমিতি নামে সংগঠন তৈরি করে সঙ্ঘের প্রচারক মনোমোহন রায়ের নেতৃত্বে স্থানীয়ভাবে প্রথমে আন্দোলন শুরু করলেও তা সমগ্র রাজ্যব্যাপী বিস্তৃত হয়। ব্যাপক জনআন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য ১৯৮০ সালে পুলিশ জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে সুধীর রায়কে যেমন হত্যা করে, তেমনি আরও প্রায় ৫০ জন আন্দোলনকারীকে আহত করে। ১৯৯২ সালের ২৫ জুন ভারত সরকার তিনবিঘা হস্তান্তরের দিন ধার্য করলে এই আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিদ্যার্থী পরিষদ সংযুক্ত হয়। ফলে আন্দোলন সর্বভারতীয়রূপ ধারণ করে। ২৬ জুন শ্রীলালকৃষ্ণ আডবাণী ও বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় কার্যকর্তা প্রফেসর মনোহর রাও কুচলিবাড়িতে এসে পৌঁছালে পুলিশের গুলিতে জিতেন রায় ও ক্ষিতেন অধিকারী নামে দুজন সত্যাগ্রহী প্রাণ হারান এবং বহু সত্যাগ্রহী লাঠির আঘাতে আহত হন। এই তীব্র আন্দোলনের ফলে তিনবিঘাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখতে সরকার বাধ্য হয় ও করিডোর নির্মাণ করে বাংলাদেশের ভূভাগে সেখানকার অধিবাসীদের প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অধিকার প্রদান করে।

জাতীয় মহাপুরুষদের সম্মান দানে অভিযান স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতাব্দী উৎসব উদ্‌যাপন :-

১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভে অসমর্থ হলে জাতীয় জীবনে যে হতাশা ও অপমানবোধ সৃষ্টি হয়েছিল, জাতীয় পুনর্জাগরণের কর্ণধার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতাব্দী পালনের কার্যক্রম সেই সময় জাতীয় জীবনে সঞ্জীবনীশক্তি এনে দিয়েছিল। কন্যাকুমারীতে সমুদ্রস্থিত শিলার উপর বিবেকানন্দ শিলা স্মারক তৈরির সিদ্ধান্ত অখিল ভারতীয় স্তরে স্বয়ংসেবকেরা গ্রহণ করে। শ্রী মন্মথ পদ্মনাভের সভাপতিত্বে জাতীয় স্মারক সমিতি গঠন করে স্বামীজীর ভাবাদর্শ প্রচারের কার্যসূচি গ্রহণ করা হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকেরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রেরণাদায়ী অভিযানে অংশগ্রহণ করে গ্রাম ও শহরে শোভাযাত্রা, সভা, বৈঠক প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে সমাজে এক নব উন্মাদনা সৃষ্টি করেন। ১৯৬৫ সালে স্বামীজীর মানুষ তৈরির বাণী জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য অভিযান সঞ্চালন করে ১ টাকা মূল্যের একটি ছবি-সহ পোস্টকার্ড বিক্রি করে লক্ষাধিক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। ১৯৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারীতে স্মারকের উন্মোচন করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি।

জাতিকে আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং আলস্য ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার জন্য ২০১৩-১৪ সালে পুনরায় বিবেকানন্দের সার্ধশতাব্দী জন্মশতবর্ষ পালন করে স্বামী বিবেকানন্দের ভারতকে বিশ্ব গুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন সাকার করার জন্য জাতীয় ইচ্ছাশক্তি জাগরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রাম-গ্রামান্তরের যুবকদের সঙ্গে সম্পর্ক করে কল্যাণী-গয়েশপুরে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে ১২ হাজার যুবকের উপস্থিতিতে এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। সারা বছর ধরে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, গ্রামোন্নয়নের বিবিধ কার্যসূচি বিবেকানন্দের কর্মজীবন সম্বন্ধিত সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচার প্রভৃতি আয়োজনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশতাব্দী আয়োজন সমিতি সংগঠন করা হয়েছিল, তার দ্বারা সর্বশেষ সভা কলকাতাস্থিত শহিদ মিনার ময়দানে ৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালে আয়োজিত হয়। এই সভায় প্রায় ১৫ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল।

ডাঃ হেডগেওয়ার জন্মশতাব্দী উৎসব উদ্‌যাপন

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডঃ হেডগেওয়ারের জীবন ও অভিজ্ঞতার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে তাঁর বাণী জনতার কাছে পৌঁছানোর জন্য দ্রুতগতিতে হিন্দু জাগরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর সেবার নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করার জন্য ১৯৮৮ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ডাঃ হেডগেওয়ারের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি সমিতি গঠন করে জন সম্পর্ক অভিযানের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

রাজ্যের শতাধিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ডাক্তারজীর কর্মজীবন বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়, তেমনি প্রদেশের সমস্ত নগরেও স্বয়ংসেবক ও নাগরিকের উপস্থিতিতে বিশাল বিশাল সভার আয়োজন করা হয়। ব্যাপক পরিবার সম্পর্ক করে অর্থ সংগ্রহও

কার্যসূচির অঙ্গ ছিল। ফলে ৫ লক্ষ পরিবার সম্পর্কিত হয়। প্রায় ১০ হাজার গ্রামেও এই সম্পর্কে অভিযান সঞ্চালন করা হয়। জন্মশতাব্দী উৎসব পালনের মাধ্যমে যে সেবানিধি সংগৃহীত হয় তার দ্বারা সঙ্ঘের সেবা বিভাগের বিস্তার ও বিকাশ সাধিত হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতাব্দী উৎসব সঙ্ঘ, বিদ্যার্থী পরিষদ, বিদ্যাভারতী এবং হিন্দুজাগরণের কাজে নিযুক্ত সংস্থা দ্বারা প্রদেশের প্রমুখ শহর-সহ বহু স্থানে পালনের ব্যবস্থা করা হয়। এই কার্যক্রমে লক্ষণীয়ভাবে যুবক ও বালকদের অংশগ্রহণে উৎসাহ ছিল। এই কার্যক্রম উপলক্ষ্যে কলকাতায় ৯ হাজার স্বয়ংসেবক চারভাগে বিভক্ত হয়ে পথসঞ্চালন করে এবং পরে উৎসাহজনক প্রকাশ্য সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়। 'নেতাজী, হিন্দুত্ব ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক' নামে একটি পুস্তিকার ব্যাপক প্রচার এই উৎসবকে উপলক্ষ্য করে করা হয় যার মধ্যে ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্কের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার কথা শুনে রাজ্যের সাংবাদিকরাও বিস্ময় প্রকাশ করেন।

পূজনীয় শ্রীগুরুজীর জন্মশতবর্ষ

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ সমগ্র দেশে যেভাবে বিস্তারিত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বের চিন্তকগণ যে সংগঠন বিষয়ে জ্ঞানলাভে ঔৎসুক্য প্রকাশ করছেন তা অধিকতম শ্রেয় শ্রীমাধব সদাশিব গোলওয়ালকর বা শ্রীগুরুজীর নেতৃত্বেরই প্রাপ্য। ঋষিতুল্য পূজ্য শ্রীগুরুজী আমাদের সনাতন রাষ্ট্রকে নিজের শাশ্বত অধিষ্ঠানে হিন্দুত্বের ভিত্তিতে সুস্থাপিত করে হিন্দুসমাজকে জাগ্রত এবং সংগঠিত করেন এবং এই আদর্শকে লাভ করার জন্য যুবকদের মধ্যে ধ্যেয়বাদের প্রখর অগ্নি প্রজ্বলিত করেন। যার ফলে তারা নিজের জীবন 'ইদং ন মম ইদং রাষ্ট্রায়'-এর যজ্ঞপথে অগ্রসর হতে সানন্দে প্রস্তুত হয়েছিল। এই যজ্ঞাগ্নিকে প্রজ্বলিত রেখে ভারতকে বিশ্বগুরুর আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ২০০৬-০৭ সাল ব্যাপী জনজাগরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় শ্রীগুরুজী জন্মশতাব্দী উদ্‌যাপন সমিতি গঠন করে। স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের সম্মিলিত সমাবেশের আয়োজন ব্যাপকভাবে করা হলেও অধিক সংখ্যায় স্বয়ংসেবকদের সম্মিলিত করে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এই কার্যক্রমের ফলস্বরূপ শতাধিক যুবক উৎসাহিত হয়ে রাজ্যে সঙ্ঘের কাজকে বিস্তার করার জন্য প্রচারক ও বিস্তারক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেছিল, যার ফলে এক বছরের মধ্যে সঙ্ঘকাজের ব্যাপক বিস্তার পশ্চিমবঙ্গে হয়।

সঙ্ঘকার্য বিস্তারের জন্য অভিযান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর এবং ৭৫ বছর পূর্তি যথাক্রমে ১৯৮৫ ও ২০০০ সালে হলে ভারতব্যাপী জনজাগরণ অভিযান সঞ্চালনের কার্যক্রম সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী সমিতি গ্রহণ করে। এই দীর্ঘসময়ে অর্থাৎ ১৯৮৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত কালখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থায় স্বয়ংসেবকেরা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল। বহু শাখা সেসময় বন্ধ হয়ে গেছিল। সঙ্ঘের নামে দুর্নাম প্রচারের জন্য জনমানস সঙ্ঘ বিমুখ হয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের জনতার ভ্রম দূর করার জন্য এবং স্বয়ংসেবকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্র জাগরণ অভিযান সঞ্চালন সমিতি, পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমে ব্যাপক জন সম্পর্কের কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথমবার অভিযানের সময় রাষ্ট্রীয় পুনর্জাগরণের অগ্রদূত---'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়, সেরকমই দ্বিতীয়বার অভিযানের সময় প্রকাশ করা হয় 'সঙ্ঘ গাথা' নামে একটি পুস্তিকা। এই পুস্তিকা জনসম্পর্কের সময় বিভিন্ন পরিবারে নিয়ে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে প্রদান করা হয়। বিভিন্ন স্থানে স্বয়ংসেবক সম্মেলনে ব্যাপকভাবে নাগরিকদের উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সঙ্ঘকে জানার জন্য এবং কার্যক্রম দর্শনের জন্য মানুষের আগ্রহ যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারাও নিজেদের দুর্বলতা, ভীতি ও নিরাশা পরিত্যাগ করে জনজাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ফলে পুনরায় কাজের কিছুটা গতি সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় জাগরণ

জাতীয় শ্রদ্ধার কেন্দ্রের পুনরুজ্জীবন জনতার ভাবাত্মক একাত্মতার জাগরণের মাধ্যমেই যে সম্ভব তার জীবন্ত উদাহরণ হল **একাত্মতা রথযাত্রার** কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক জনজাগরণ। ১৯৮৩ সালের নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে বিশ্বহিন্দু পরিষদ আয়োজিত এই যজ্ঞযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল ভারতমাতার প্রতি জনতার মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব জাগ্রত করা।

এই রথযাত্রার প্রধান মাধ্যম যে তিনটি রথ তার মধ্যে দুটি রথ পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছিল। প্রথম রথটি ছিল গঙ্গাসাগর থেকে সোমনাথ মন্দির পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি ছিল নেপালের পশুপতিনাথ মন্দির থেকে রামেশ্বরম্ পর্যন্ত। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এই রথ যাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রতিটি জেলা নিজস্ব রথ তৈরি করে উপযাত্রার আয়োজন করে। সুসজ্জিত যন্ত্রচালিত মুখ্য রথে ছিল ভারতমাতার সুন্দর একটি চিত্র এবং দুটি বড় বড় কলস, যার মধ্যে একটিতে ছিল গঙ্গোত্রী থেকে সংগৃহীত গঙ্গাজল এবং অপরটি ছিল ভারতের সমস্ত পবিত্র নদীর জল সংগ্রহের জন্য। প্রতিদিন মুখ্য রথ দুটি ১০০ কিলোমিটার যাত্রা করে বিশ্রাম গ্রহণ করতো এবং বিশ্রাম স্থলে যেমন আগত ভক্তদের জল সংগৃহীত হতো তেমনি সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যদিকে প্রতি ২৫ কিলোমিটার অন্তর রথটি কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করে রথকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য যে সমস্ত ভক্ত অপেক্ষা করেছিল তাদের আনা জলও সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অন্য একটি

উপযাত্রার সঙ্গে সম্বন্ধিত রথ অরুণাচলের পরশুরাম কুণ্ডের পবিত্র মন্দির থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, সেটিও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। এই যজ্ঞের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ভারতের প্রায় ৫০ কোটি হিন্দুর ৮৫টি প্রধান মত ও সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যের মাধ্যমে। এই রথযাত্রাকে সফল করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি গ্রামের মানুষদের নিয়ে বৈঠক করে যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং গ্রামবাসীকে স্থানীয় নদী বা পুকুর হতে জল সংগ্রহ করে রথের বিভিন্ন বিশ্রাম স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। ভারতমাতার জয়ধ্বনি দেশবাসীর মধ্যে দেশভক্তি ও জাতীয়তার প্রবল জোয়ার কীভাবে সৃষ্টি করতে পারে তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ হলো এই একাত্মতা রথযাত্রা। উত্তরবঙ্গের সম্মেলনগুলিতে জনজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষদের জমায়েত ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়।

১৯৯৫ সালে আয়োজিত **দ্বিতীয় একাত্মতা যাত্রা** পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের হৃদয়ে বিশেষ করে গ্রামবাসীদের মধ্যে ভারতমাতা, গঙ্গামাতা ও গোমাতার প্রতি শাশ্বত আস্থা জাগ্রত করতে সফল হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৫ হাজার মৌজার দেড় লক্ষ ব্যক্তির কাছে যাত্রার উদ্দেশ্য এবং গোরক্ষা বিষয়ে পত্রক ও পুস্তিকা বণ্টন করে বিশাল প্রচার অভিযান শুরু করা হয়েছিল। এই অভিযান পরিচালনার জন্য গঠিত হয়েছিল সংবর্ধনা সমিতি। এই যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ মঠ ও আশ্রমের প্রায় শতাধিক সাধুসন্তের অংশগ্রহণ যাত্রার ধর্মীয়স্বরূপ বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। প্রত্যেক সভাস্থলে আগত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ (খিচুড়ি) বিতরণ করা হয় এবং তামার পাত্রে যে গঙ্গাজল রাখা হয়েছিল তা বিতরণ করা হয়।

গঙ্গা সঙ্কর্ষণ যাত্রা - ১৯৯৭

১৯৯৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি যন্ত্রচালিত জলযানের মাধ্যমে **'শ্রী গঙ্গা সংকর্ষণ যাত্রা'র** সূচনা করা হয়। এই অভিযানের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল, যথা (১) তেহরে বাঁধ পরিকল্পনা বন্ধ করা (২) গঙ্গাদূষণ বন্ধ করা এবং (৩) বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গাজল চুক্তি রদ করা।

গঙ্গাসাগর থেকে নিয়ে আসা জল কলস ও গঙ্গাজলের পূজা কলকাতার বাগবাজারে একটি যন্ত্রচালিত জলযানে (লঞ্চে) সম্পন্ন করে এই যাত্রার শুভারম্ভের নির্দেশ দেন স্বামী চিন্ময়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অধিকারীগণ। ১৭ জন সাধুসন্ত এই লঞ্চে ছিলেন যারা যাত্রাপথের ২০টি স্থানে গঙ্গা আরতি করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ৫৮ কিলোমিটার যাত্রাপথে ২০টি স্থানে বিভিন্ন স্থানের জনতার সঙ্গে সম্পর্ক করে যাদের সেখানে সমবেত করা হয়েছিল তাদের সমক্ষে এই যাত্রার বিষয়ে বক্তব্য রাখে বিভিন্ন সন্ত ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অধিকারীগণ। প্রায় ৫ হাজার ভক্ত গঙ্গামাতার পবিত্রতা রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করে।

রাম জন্মভূমি উদ্ধার ও শিলাপূজন অভিযান

১৫২৮ সালে যেদিন মুঘল আক্রমণকারী বাবর অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মস্থান শ্রীরাম জন্মভূমির পবিত্র স্থানে স্থিত মন্দিরকে ধ্বংস করে মসজিদের এক অপূর্ণ কাঠামো তৈরি করেছিল, সেইদিন থেকে তা সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। কারণ শ্রীরামচন্দ্র একজন ঐতিহাসিক পুরুষ, তিনি ভারতের পবিত্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ গুণের সর্বোচ্চ আদর্শ মর্যাদা পুরুষোত্তম স্বরূপ। তাঁর জন্মভূমিতে নির্মিত পবিত্র মন্দিরের বিধ্বংসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা এবং প্রাদেশিক ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ৭৬ বার ভয়ংকর যুদ্ধ করে জাতীয় শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণাহুতি দিয়েছেন। ফলে এই সংগ্রাম পরাধীনতার কলঙ্ক মোচনের প্রতীক হিসেবে প্রতিটি হিন্দুর মনে রেখাপাত করেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্ম সংসদ ১৯৮৪ সালে নতুন দিল্লিতে বৈঠক করে এই জন্মভূমি উদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করে এবং রাম জানকী রথযাত্রার মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশে জনজাগরণ অভিযান পরিচালনা করে। এই জনজাগৃতির কারণে সমাজে যে প্রভাব সৃষ্টি হয় তার পরোক্ষ প্রভাবের ফলে ফৈজাবাদ জেলা বিচারক ১৯৮৬ সালে ১ ফেব্রুয়ারি রামজন্মভূমির মন্দিরের তালা খোলার আদেশ প্রদান করেন। ওই দিন সন্ধ্যা থেকেই রামলালা দর্শনের অনুমতিও দর্শনার্থীগণ লাভ করে। প্রয়াগের মহাকুম্ভের সময় ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে ধর্ম সংসদ সংকল্প গ্রহণ করে যে অযোধ্যার রামজন্মভূমি স্থানে শিলান্যাসের ব্যবস্থার জন্য দেশব্যাপী শিলাপূজন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এই সিদ্ধান্তকে হিন্দু সমাজ সানন্দে সমর্থন করে। সমগ্র দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজও শিলাপূজন কার্যক্রমের সূচনা করে যার জন্য বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকর্তাদের সঙ্গে সমগ্র প্রদেশের স্বয়ংসেবকগণ যুক্ত হয়ে প্রান্তের প্রায় প্রতিটি মুখ্য গ্রামে ও শহরের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করে রামজন্মভূমির মন্দির বিষয়ে সঠিক তথ্য দান করে। তাদের মধ্যে জাগৃতি সৃষ্টি করে শিলাপূজনের দিন-ক্ষণ প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথকভাবে নির্ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট রাজ্য সরকার সবরকম চেষ্টা করে এই কার্যক্রমকে বিফল করার চেষ্টা করলেও সাধারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তি সবরকম অত্যাচার সহ্য করে কার্যক্রমকে সফল করে এবং অযোধ্যায় নির্বিঘ্নে সমস্ত শিলা পৌঁছানোর জন্য সরকারই সবরকম সাহায্য করে। ৯.১১.১৯৮৯ তারিখ নির্ধারিত সময়ে অযোধ্যায় শিলান্যাসের কার্যক্রম যেদিন সফল হয় সেদিনই জার্মানি বিভাজনের প্রতীক বার্লিনের সুদীর্ঘ প্রাচীরও সেখানকার জনতা ধ্বংস করে দেয়। ১৯৪৭ সালের দেশের স্বাধীনতা লাভের পর শিলান্যাসের ঘটনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলে

সাংবাদিকরা প্রচার করেছিলেন।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে রামমন্দির নির্মাণের জন্য অবিরাম করসেবার আয়োজনের সিদ্ধান্ত পঞ্চম ধর্মসংসদ গ্রহণ করে। গ্রাম- গ্রামান্তরে, শহরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসম্পর্ক, সভা ও বৈঠকের কার্যক্রম সম্পন্ন করে। করসেবকের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং যথাসময়ে অযোধ্যা প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশ্ববাসী ভালভাবেই জেনেছে যে ওইদিন শ্রীরাম জন্মভূমির পবিত্র স্থানে ৪০০ বছরের বেশি সময় ধরে যে কলঙ্কস্বরূপ কাঠামো অবস্থান করছিল তা আক্রোশের কারণে ক্ষুব্ধ করসেবকরা বিধ্বস্ত করে কাঠামোর কোনও প্রমাণই সেখানে রাখেনি। সেদিনই অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ করে শ্রীরামলালাকে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা তারা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কলকাতার দুই করসেবক রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী মুলায়ম সিংহের পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু এই মহান কাজের জন্য অত্যাচারী শাসকের কুকৃত্যের জন্য তারা প্রাণোৎসর্গ করলেও সারা ভারতবর্ষের হিন্দু হৃদয়ে তারা এক সম্ভ্রমের স্থান দখল করে আছেন।

নিঃশব্দ বিদেশি আক্রমণের প্রতিবাদ সীমান্ত শান্তি ও সুরক্ষা সমিতি :—

১৯৮৫ সালের আগে অসমের মতো পশ্চিমবঙ্গে যে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটেছে সে বিষয়ে বাঙ্গালিদের কোনো ধারণাই ছিল না। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুপ্রবেশের ভয়াবহতা বিষয়ে বাঙ্গালিকে সচেতন করার জন্য এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যা বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য এই সম্মেলনে ন্যায়মূর্তি এইচআর খান্না, লেফটেন্যান্ট জেনেরাল জগদীশ সিংহ অরোরা, শ্রীরাম জেঠমালানি এবং সমর গুহের মতো গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে দাবি করা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিশেষ জনগণনার ব্যবস্থা করে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী তৈরি করা হোক। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস দল এই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংকে পরিণত করার জন্য অনুপ্রবেশ বিষয়ে কোনোরূপ তথ্য কখনই প্রকাশ করেনি। কিন্তু এই সমস্যা বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন উপলব্ধি করে স্বয়ংসেবকেরা **'সীমান্ত শান্তি ও সুরক্ষা সমিতি'** নামে একটি সংগঠন তৈরি করে, যার সভাপতি হয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহকর্মী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। এই সমিতির দ্বারা সঞ্চালিত অভিযানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যা বিষয়ে যেমন জনচেতনা সৃষ্টি করা হয়, তেমনি অনুপ্রবেশকারীদের একটি সংখ্যা তথ্যও প্রচার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমাচার পত্রেও প্রকাশিত হয় যে বিগত দশ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫ লক্ষ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী প্রবেশ করে এই রাজ্যের ভোটাধিকার লাভ করেছে এবং রাজ্যের মোট জনসংখ্যার চেয়ে প্রায় দশ লক্ষ বেশি রেশনকার্ডও বণ্টিত হয়েছে। সমিতির দ্বারা সাংবাদিক সম্মেলন, সার্বজনিক সভা, জনজাগরণ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হলে রাজ্য সরকারও এ বিষয়ে কিছুটা তৎপরতা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী অরুণ নেহরু এই সময় সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য তিনগুণ অর্ধসেনা মোতায়েন করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে সীমান্তে বসবাসকারী হিন্দু জনতাকে অনুপ্রবেশ ও বাংলাদেশি গুন্ডাদের দ্বারা বিভিন্ন অত্যাচার বিষয়ে সচেতন করার জন্য **'সীমান্ত প্রণাম'** নামে বিশেষ এক জনজাগরণের কার্যক্রম সঞ্চালিত করে।

আর্থিক ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলন

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের দ্বারা পক্ষকালব্যাপী যে স্বদেশী সুরক্ষা জাগরণ অভিযান সঞ্চালিত হয়েছিল তার মাধ্যমে স্বয়ংসেবকরা এক শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণাদায়ী অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। গ্রামবাসী, জনজাতি জনগোষ্ঠী ও শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। শহরের মধ্যবিত্তীয় ও উচ্চবিত্তীয় ব্যক্তিগণ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে স্বদেশী বিষয়ের ভাবনা আরও স্পষ্ট করা দরকার এবং স্বদেশীয় মূল ভাবনা ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, পরিবেশবিদ প্রভৃতি সমস্ত বিচারধারার ব্যক্তিরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মঞ্চকে একটি সর্বদলীয় জাতীয় স্বরূপ প্রদান করে। কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যখন তাদের ব্যবসাবাণিজ্য এবং শুল্কের উপর সাধারণ চুক্তি বা গ্যাট, বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন অর্থাৎ 'হু' তথা সার্বভৌমীকরণ প্রভৃতির অপপ্রচার বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন তখন মনে হয়েছিল যে তাঁদের স্বদেশী বিষয়ে আরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁরাও স্বদেশী বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এক নতুন পথনির্দেশ করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে সমস্ত রকমের ভেদাভেদ ভুলে মানুষ খোলামনে এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং নিঃসংকোচে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, যার ফলে প্রতিটি শহরে ও ব্যবসায়িক স্থলে যে সমস্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে জনতার প্লাবন লক্ষ্য করা গেছিল।

এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছিল। কেননা সঙ্ঘকে জানার আগ্রহ সমাজে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। আন্দোলনের ফলে লোকশিক্ষার প্রসার ঘটে। যার ফলে জনতার 'মত' কিছুটা পরিবর্তিত হলেও তা কিন্তু স্থায়িত্ব লাভ করে না। এই স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন লোক সংস্কার ও সংগঠন যার মাধ্যমে 'মত' পরিবর্তনের বদলে 'মন' পরিবর্তিত হয় এবং সমাজের পরিবর্তনে স্থায়িত্ব আসে।

(লেখক সঙ্ঘের পূর্বতন পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ)

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৪০)

সঙ্ঘভুক্তি পদ্ধতি ও প্রথম সঙ্ঘস্থান

শ্রী অনন্ত গণেশ সোহনী সংক্ষেপে যিনি আন্না সোহনী নামে সকলের কাছে প্রিয়, তিনি শাখায় লাঠিখেলা, তলোয়ার, বর্শা, ছুরিকা ইত্যাদির দ্বারা নানা যুদ্ধযোগের অভ্যাস শুরু করেছিলেন। এর ফলে শাখায় নতুন নতুন তরুণ কিশোরদের অনেক মাত্রায় আসা শুরু হলো। কিন্তু এলেই তাদের পক্ষে সঙ্গে প্রবেশ সম্ভব হতো না। ডাক্তারজী তাঁর অনুপম সংগঠন প্রতিভার গভীর অনুভূতির দ্বারা কয়েকবার তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তবে অনুমতি দিতেন। এই কথাবার্তা হতো খুবই সহজ ও সাবলীল পরিবেশে, তাদের স্বভাব মনোবৃত্তি ও গুণগুলি তিনি পরখ করে নিতে চাইতেন। নবাগত সদস্যের নাম, বয়স, গ্রাম, শিক্ষা অভিভাবক, বন্ধু, সন্ধ্যার সময় কী করে, এ বিষয়ে জেনে নিতেন। এর পরে তাদেরকে নানা প্রশ্ন করে তার গভীরতা বা বোধশক্তি কত তা জানতে চাইতেন।

কত রকম প্রশ্ন! এখান থেকে ফেরার সময় পুলিশ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে ডাঃ হেডগেওয়ারের কাছে কেন গিয়েছিলে? কী বলবে? সঙ্ঘে কেন আসতে চাও? কাল যদি শাখায় মতভেদ হয় তাহলে কী করবে? লাঠিখেলা শেখার ইচ্ছা কেন? একলা লাঠিখেলা শিখে কি হবে? তুমি তোমার সঙ্গে আর কতজন তরুণকে আনতে পারবে? আবার তেমন কোনো তরুণের দেখা পেলে জিজ্ঞেস করতেন— স্বরাজ্যের অর্থ কী? স্বরাজ চাই এ কথা মুখে কতজন বলে আর তার জন্য প্রত্যক্ষ প্রয়াস কত জন করে?

ডাক্তারজীর এই সমস্ত প্রশ্ন কোনো সাক্ষাৎকারের মতো হতো না। এগুলি তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ধ্যেয়নিষ্ঠা, ত্যাগ ও রাষ্ট্রভক্তির বেদীতল থেকে উৎসারিত হতো। যার ফলে যারাই আসতো খুব সহজে তারা ডাক্তারজীর প্রতি পূর্ণ কথোপকথনে আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। তাঁর সঙ্গে কথা বলে ফেরার সময়ে তিনি সিঁড়ি পর্যন্ত আসতেন, তার কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন— আবার কবে আসবে? কিছু সময়ের জন্য হলেও নবাগতের পা থেমে যেতো। এটাই সঙ্ঘ সংগঠনের শাশ্বত গোপন চাবি কাঠি।

সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় 'ইতবার দরওয়াজা প্রাথমিক বিদ্যালয়'-এর মাঠে আর জায়গা হচ্ছিল না। খুঁজতে খুঁজতে মাথায় এলো মোহিতের প্রাঙ্গণের কথা, যেখানে ১৯০৮-৯ সালে বিপ্লবের গোপন কাজ কর্ম হতো। এটা একটা ছোটোখাটো দুর্গের মতো। ১৯২৬ সালে তার প্রায় পূর্ণ ভগ্ন দশা। একসময় মারাঠা সরদারী বৃদ্ধা সালুবাঈ মান-মর্যাদা, দেশাভিমান নিয়ে বসবাস করতেন। একজন সেপাই ছিল, ভেতরে যেতে অনুমতি লাগতো। আজ তিনি নেই, নেই কোনো উত্তরাধিকারী। দেয়াল, পাঁচিল ভেঙে ধ্বংসস্তূপ। ডাক্তারজী, ডাঃ পরাঞ্জপে এই জায়গার সদ্ব্যবহার করতে চাইলেন। ভাউজী কাওরে এ বিষয়ে খুব মজা করে ডাক্তারজীকে বললেন— 'শ্রীমতি সালুবাঈয়ের প্রাসাদ ভূতেদের হস্তগত হয়েছিল, আজকাল তার উত্তরাধিকার আমরা লাভ করলাম। আমরা যেভাবে ইচ্ছে এর সদ্ব্যবহার করতে পারি।' ডাক্তারজী ও অন্য স্বয়ংসেবকরা কোদাল, শাবল, গাইতি নিয়ে নেমে পড়লেন ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের কাজে। কাজে তদারকি নয়, ডাক্তারজী নিজে হাতে সকলের সঙ্গে সেই ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কারের কাজে সক্রিয় থেকে স্বয়ংসেবকত্বের প্রথম পাঠ সকলকে শিখিয়েছিলেন। স্বয়ংসেবকদের কাছে এ ছিল অন্যতম প্রেরণার উদাহরণ। এ ভাবেই তৈরি হলো মোহিতের প্রথম সঙ্ঘস্থান।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস